ইনকিলাব

নিমাই ভট্টাচার্য

অনন্য প্রকাশন

৬৬ কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল) কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৬১

প্রকাশক
হীরক রায়
অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল)
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর
কমলা পতি ভুক্ত
লিপি মুদ্রণ
৯এ, হরিপাল লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

সঙ্গীত সুধাকর
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বন্ধুবরেষু

সবিনয় নিবেদন,

বেশ ক'বছর আগে 'রাজধানীর নেপথ্যে' লেখা থেকে আপনাদের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ। তারপর ভি-আই-পি, পার্লামেণ্ট স্ট্রীট, মেমসাহেব, ডিপ্লোম্যাট, ককৃটেল, ম্যাডাম, তোমাকে, ডিফেন্স কলোনী, উইং কমাণ্ডার লিখে সে যোগাযোগ আরো গভীর ও দৃঢ় হয়েছে এবং এজন্য আপনাদের সবার কাছে আমি অপরিসীম ঋণী। সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে আরেক নিমাই ভট্টাচার্যের বই বেরিয়েছে। হয়তো আরো বেরোবে, সেজন্য আপনাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আমার বই কেনার আগে অনুগ্রহ করে আমার লেখা বইয়ের তালিকা ও মুদ্রিত স্বাক্ষর দেখে নেবেন।

সকৃতজ্ঞ

নিমাই ভট্টাচার্য

এই লেখকের অন্যান্য বই

মেমসাহেব
ডিপ্লোম্যাট
প্রবেশ নিষেধ
ডিফেন্স কলোনী
রিপোর্টার
এ-ডি-সি
ব্যাচেলার
কেরানী
রাজধানীর নেপথ্যে
ভি-আই-পি
যৌবন নিকুঞ্জে
তোমাকে
অনুরোধের আসর
পার্লামেন্ট ষ্ট্রীট
উইং কমাণ্ডার
পিকাডিলী সার্কাস
ম্যাডাম
হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স
ককটেল
আকাশ-ভরা সূর্য তারা
শেষ পারানির কড়ি
রাজধানী এক্সপ্রেস
ওয়ান আপ টু ডাউন
মোগলসরাই জংসন
কেয়ার অব, ইণ্ডিয়ান এম্বাসী
নাচনী
অন্যদিন
ভায়া ডালহৌসী

মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণ শেষ হতেই অযোধ্যা সিমেণ্ট কোম্পানীর তরুণ ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিজয় কেজরিওয়াল মাইক্রোফোনে ঘোষণা করলেন, যাঁরা অনুপ্রেরণায় ও আন্তরিক সহযোগিতায় এই সিমেণ্ট কারখানা আজ চালু হচ্ছে, আমাদের সেই পরম শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীকে এবার প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে অনুরোধ করছি।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে হাততালি পড়ল। অভিনন্দিত হলো ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘোষণা।

মুখ্যমন্ত্রী গভর্ণরের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চেয়ার ছেড়ে মাইক্রোফোনের সামনে আসতেই দুম্-দুম্-দুম্! লাটসাহেব, মুখ্যমন্ত্রী থেকে সমবেত কয়েক হাজার মানুষ ভয়ে আঁতকে উঠলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিস-সুপার ও তাঁর কয়েক শ অনুচরেরা হতবাক। বিস্ময় কাটবার আগেই প্যাণ্ডেলের এক পাশ থেকে একজন শ্রমিক চিৎকার করে উঠলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী…

জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী!
জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী!
জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!

একটু আগে ঘাবড়ে গেলেও নিজের জয়ধ্বনি শুনে মুখ্যমন্ত্রী ভীষণ খুশী। সারা মুখখানা খুশীর হাসিতে ভরে গেল। ভাবাবেগে মনের কথা চেপে রাখতে পারলেন না।—সত্যি কথা বলছি বোমার আওয়াজে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এ সব কলকাতার স্টাইলে অভ্যর্থনা পেতে আমরা ঠিক অভ্যস্ত না হলেও বলতে দ্বিধা নেই ভালই লাগল। এ ভাবে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অযোধ্যা সিমেণ্ট কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মী বন্ধুদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে হাততালি।

সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রমিক নেতা চিৎকার করে উঠলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী!

জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!

মুখ্যমন্ত্রী একটু থেমে আবার শুরু করলেন, খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই কয়েকটি প্রদেশে গত কয়েক বছর ধরে এমন বিচ্ছিরি রাজনৈতিক অশান্তি চলেছে যে বহু শিল্পপতিই একটু শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য আমাদের রাজ্যে এসেছেন। আমরা চাই না কোথাও কোন অশান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি হোক; কারণ তাতে সারা দেশের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়। যাই হোক, আমাদের রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠলেও তা সারা দেশের মানুষেরই জন্য…

হাততালি।

বন্ধুগণ, আধুনিক জীবনে সিমেন্টের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। ঘড়বাড়ী, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, ব্রীজ—সব কিছুতেই সিমেন্ট চাই। আমি আশা করব এই কারখানার শ্রমিক ও কর্মীদের প্রচেষ্টায় এই কারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের-দশের কল্যাণ হবে। আর একটি কথা বলতে চাই যে এই অঞ্চলটি বড়ই অনগ্রসর। বলতে লজ্জা হলেও এ কথা সত্য এখানকার মানুষ এখনও সপ্তদশ শতাব্দীর অন্ধকারে পড়ে আছে। আধুনিক বিজ্ঞানের কোন আশীর্বাদ এরা উপভোগ করার সুযোগ পায় নি। এই বিরাট ও আধুনিক সিমেন্ট কারখানার জন্য এই অঞ্চলের অসংখ্য হতভাগ্য মানুষের জীবনেও আমূল পরিবর্তন আসবে। ইতিমধ্যেই অনেক কিছু হয়েছে এবং আরো হবে। গণ্ডগ্রামের মানুষের জীবনে এই বিবর্তনই হচ্ছে প্রকৃত বিপ্লব—ইনকিলাব। তাই তো বলি এই বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। বলুন, ইনকিলাব, জিন্দাবাদ!

ইনকিলাব !

জিন্দাবাদ !

ইনকিলাব !

জিন্দাবাদ !

ইনকিলাব !

জিন্দাবাদ !

মুখ্যমন্ত্রী নিজের আসনে ফিরে যেতেই স্বদেশ বর্মন কোথা থেকে ছিটকে এসে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, মুখ্যমন্ত্রী !

শত শত কণ্ঠ গর্জে উঠল, যুগ যুগ জীও !

যুগ যুগ জীও !

মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ছেলেটিকে কি কলকাতা থেকে এনেছ ?

হ্যাঁ ।

খুব ওস্তাদ আছে তো ।

হ্যাঁ, ছেলেটি খুব ভাল । ইন ফ্যাক্ট আমি যাদেরই কলকাতা থেকে এনেছি তারা প্রত্যেকেই খুব ভাল ।

মুখ্যমন্ত্রী ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, আরে তোমাকে কি বলব বিজয় । আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে কম ইণ্ডাস্ট্রি তো চালু করলাম না ! প্রত্যেকেই আমাকে বলেছেন কলকাতার একজন ওয়ার্কার যা কাজ করে, এখানকার তিনজনে তা পারে না ।

ছাট্‌স রাইট । আমি যদি কলকাতা থেকে লোকজন না আনতাম তা হলে এই ফ্যাক্টরী চালু হতে আরো এক-দেড় বছর দেরী হতো ।

তাই নাকি ?

তা ছাড়া প্রোডাকশন এত হতো নাকি? কলকাতার একজন মিস্ত্রী যে কাজ হাসতে হাসতে করবে, তা করতে এখানকার অনেক এঞ্জিনিয়ারও সাহস পাবেন না।

আরে বিজয়, এ সব কিছু কিছু বিশেষ কারণ না হলে কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে এমনি এমনি এত রকমের ইণ্ডাস্ট্রি এত বছর ধরে চলতে পারে?

ওদিকে স্থানীয় এম-এল-এ'র ভাষণ চলছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী আর বিজয় কেজরিওয়ালের কথাবার্তা চলছে। বিজয়বাবু বললেন, আমাদের জয়ন্তী ফ্যানের ফ্যাক্টরীতে সাত মাস ধরে স্ট্রাইক চলার পর পাঁচ মাসের প্রডাকশনে আমাদের সমস্ত লস্ কভার করার পর এক কোটি আঠাশ লাখ টাকা লাভ হয়েছে। বোম্বে বা মাদ্রাজের কোন কারখানায় এ হতে পারে না।

মুখ্যমন্ত্রী মাথা নেড়ে বললেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাইরে আমরা যাই বলি না কেন, কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার আনন্দই আলাদা।

কলকাতার যে সব লোকজনকে এখানে এনেছ তাঁরা এখানে থাকবেন তো?

বিজয়বাবু একটু হেসে বললেন, একটু বেশী মাইনে আর কিছু এ্যাডিশন্যাল সুযোগ-সুবিধে দিয়ে এনেছি। তা ছাড়া এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের কাছে বহুকাল ধরে কাজ করছেন। এঁদের সবার সঙ্গেই আমাদের একটা অন্য ধরনের সম্পর্ক...

মুখ্যমন্ত্রী ওঁর মুখের কথাটি কেড়ে নিয়ে বললেন, ওয়ার্কারদের সঙ্গে যদি ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতে পার তাহলে কারখানা চালাতে অসুবিধা হবে না।

আমি যদি ব্যক্তিগত ভাবে এই শঙ্করগড়ের লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা না করতাম তাহলে হয়তো এখানে ফ্যাক্টরী করাই মুশকিল হতো।

ঠিক বলেছ।

আমি এই গ্রামের প্রত্যেকটা লোককে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

খুব ভাল করেছ।

বক্তৃতা পর্ব শেষ হতেই গভর্ণর একটা সুইচ টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরীর চারদিকে সাইরেন বেজে উঠল। অযোধ্যা সিমেণ্ট কোম্পানীর যাত্রা শুরু হল।

এর পর বিজয়বাবু গভর্ণর ও মুখ্যমন্ত্রীকে জীপে চড়িয়ে সারা ফ্যাক্টরী দেখিয়ে শ্রমিক ও কর্মীদের কলোনীর সামনে পৌছতেই…

গভর্ণর সাহেব!

জিন্দাবাদ!

গভর্ণর সাহেব!

জিন্দাবাদ!

গভর্ণর সাহেব!

জিন্দাবাদ!

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী!

যুগ যুগ জীও!

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী!

যুগ যুগ জীও!

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী!

যুগ যুগ জীও!

মুখ্যমন্ত্রী সোনালী ফিতা কেটে কলোনীর উদ্বোধন করতেই বিজয়বাবু মথুরা প্রসাদকে কাছে ডাকলেন। মথুরা হাত জোড় করে মাথা নিচু করে মাননীয় অতিথিদের নমস্কার জানাতেই বিজয়বাবু গভর্ণর ও মুখ্যমন্ত্রীকে বল্লেন, মথুরা প্রসাদ এই শঙ্করগড়েরই বাসিন্দা। অযোধ্যা সিমেণ্ট কোম্পানীর প্রথম কর্মী। ও আপনাদের কলোনী ঘুরিয়ে দেখাবে।

মথুরা প্রসাদের এই সম্মানের কারণ আছে। ভারতবর্ষের মানচিত্র তন্নতন্ন করে খুঁজলেও শঙ্করগড়কে দেখা যাবে না। মানচিত্রে স্থান পাবার মত কোন যোগ্যতা বা পুঁজিই শঙ্করগড়ের নেই। কোর্ট-কাছারি তো দূরের কথা, একটা ছোট রেল-স্টেশন বা ডাকঘর পর্যন্ত এখানে নেই। কোর্ট-কাছারির সঙ্গে এখানকার মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। এখানকার মানুষ জমির মালিক বা প্রজা—কিছুই নয়। লড়াই-ঝগড়া বা মারামারি কাটাকাটি হলেও এরা থানা-পুলিস কোর্ট-কাছারিতে যায় না। শঙ্করনাথের বটতলায় বসে নিজেরাই নিজেদের বিচার করে। ডাকঘরেরও দরকার নেই এদের। কে এদের চিঠি লিখবে? এরাই বা কাকে চিঠি পাঠাবে? শঙ্করগড়ের গৌরবের মধ্যে গ্রাণ্ট ট্রাঙ্ক রোড আর ছোট সরু একটা খাল। গঙ্গার এক ক্ষীণ ধারাকে মাত্র তিরিশ-চল্লিশ মাইল টেনে এনেই খালের বীরত্ব শেষ। তবে কোট-প্যাণ্ট পরা একদল সাহেব জীপে চড়ে মাঝে মাঝেই খালের ধারে ঘুরতে আসেন। মথুরা প্রসাদ শুনেছে, এই খাল বড় হবে, নৌকা চলবে।

কোন কারণে বাইরের কোন সাহেব বা বাবু এ গণ্ডগ্রামের দিকে এলেই মথুরাকে এগিয়ে যেতে হয়। কোট-প্যাণ্ট পরা সাহেব বা বাবুদের সামনে দাঁড়াবার সাহস বা ক্ষমতা এ গ্রামের আর কারুর নেই। হাজার হোক, মথুরা পঁচিশ-তিরিশ বছর রেল কোম্পানীতে চাকরি করেছে। রেল কোম্পানী ওকে বছর বছর নীল রঙের উর্দি দিত, থাকবার জন্য রেল-লাইনের ধারেই পাকা ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। মথুরা গেট বন্ধ করে দিলে দু-দিকের রাস্তার উপর সারি সারি বাস-লরী ছাড়াও কত বড় বড় সাহেবদের মোটরগাড়ী পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো। মোটরগাড়ীর সাহেবরা বার বার অনুরোধ করলেও গেট খুলতো না। মথুরা সবুজ পাখা নাড়লেই রেলগাড়ী হুস-হুস করে বেরিয়ে যেতো কিন্তু লাল পাখা দেখালেই থামতো

হতো। কতবার ও লাল পাখা দেখিয়ে দিল্লী-কলকাতার রেল-গাড়ী পর্যন্ত থামিয়ে দিয়েছে। পান্না তখন খুব ছোট। ওদের বাড়ীর সামনে বিরাট রেলগাড়ীটা থেমে গেলে ওর কি আনন্দ হতো! আনন্দে হৈ-চৈ শুরু করে দিতো।

সে সব দিনগুলো মথুরার ভালই কেটেছে পান্নার মা গান গাইতে গাইতে মেয়েকে ঘুম পাড়াতে গেলেই মথুরা পাগড়ী খুলে হাসতে হাসতে কাছে বসতো। কখনো মেয়েকে আদর করতো, কখনো স্ত্রীর সঙ্গে একটু হাসি-ঠাট্টা।

আচ্ছা। পান্নার মা, এর পর তুমি কি চাও?

মতলব?

মানে এর পর তুমি ছেলে চাও নাকি মেয়ে চাও?

আমি যা চাইব, তাই কি পেতে পারি?

তা ত জানি কিন্তু তুমি কি চাও?

তুমি জেনে কি করবে? আমি ছেলে চাইলেই কি তুমি দিতে পারবে?

আউর কে দেবে?

লজ্জায় পান্নার মা ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকিয়ে বলে, তুমি বড় বেসরম হচ্ছো।

একটু পরেই মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। খাটিয়াতে মেয়েকে শুইয়ে দিতে দিতে মথুরা প্রসাদের স্ত্রী বলে, পান্না একটু বড় হলেই তুমি বড় স্টেশনে চলে যাবে।

কেন?

ওকে স্কুলে পড়াতে হবে না?

মথুরা হাসতে হাসতে বলে, শঙ্করগড়ের কোন মেয়ে তো দূরের কথা, ছেলেরাও স্কুলে যায় না।

পান্নার মা সঙ্গে সঙ্গে বেশ গর্ব করে বলে, শঙ্করগড়ের আর কোন

আদমী রেল কোম্পানীতে চাকরি করে? আর কে লাল পাখা দেখালে ডাক গাড়ী থেমে যাবে?

মথুরা আর কিছু বলে না। চুপ করে যায় কিন্তু ওর স্ত্রী চুপ করতে পারে না। বলে, পান্না জরুর স্কুলে যাবে। অনেক অনেক কিতাব পড়বে। একটার পর একটা পাস কববে। তারপর ওর সাদি দেব।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তুমি দেখে নিও। ওর সঙ্গে যার সাদি হবে, সেও রেল কোম্পানীতে নোকরি করবে।

কখনো কখনো পান্নাকে দোলনায় দোল দিতে দিতে ওর মা স্বপ্ন দেখে, একদিন পান্নার বাচ্চা হবে। তাকেও আমি এমনি ভাবে দোল দিয়ে ঘুম পাড়াব।

মথুরা ওর স্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে হাসে।

হাসছ কি? দেখে নিও ঘুম ভাঙ্গলেই সে ছেলে তোমার পাগড়ী ধরে টান দেবে।

মথুরা আরো জোরে হেসে ওঠে।

মথুরার স্ত্রী বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, আমি বলছি পান্নার ছেলে ভীষণ দুষ্টু হবে।

এবার মথুরা হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে, যদি কোন দিন লাল পাখা দেখিয়ে ডাক গাড়ী থামিয়ে দেয়?

থামবে।

মথুরা আঁতকে ওঠে, থামবে? তা হলে তো আমার নোকরি সঙ্গে সঙ্গে খতম হয়ে যাবে।

কিচ্ছু হবে না। ড্রাইভার সাহেব মুন্নাকে দেখে কিচ্ছু বলবে না।

যখন কোন গাড়ী যায় না, লেভেলক্রসিং-এর গেট খোলা থাকে তখন মথুরা খাটিয়ায় বসে পান্নাকে আদর করে। ওর স্ত্রী রুটি বানায়, সব্জী তৈরী করে। কখনো কখনো আশেপাশের গ্রামের লোকজন

যাতায়াতের পথে একটু বসে, জল খায়, গল্প করে। আবার চলে যায়। হঠাৎ ট্রলি-সাহেব ট্রলি চড়ে হাজির হলেই মথুরা তাড়াতাড়ি মাথায় পাগড়ী চড়িয়ে হাতে লাল-সবুজ পাখা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সেলাম করে। ট্রলি-সাহেব চলে যান।

তারপর আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুরিয়ে যায়। ছোট্ট গুমটি-ঘরের সামনে খাটিয়ায় বসে গড়গড়া টানতে টানতে মথুরা স্ত্রীর সঙ্গে, মেয়ের সঙ্গে অথবা গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে। দিনগুলো বেশ কেটে যায়।

কিন্তু মথুরার কপালে সুখ সইল না। পান্না যখন পাঁচ বছরের তখন শীতলা মার কৃপায় তার মা মারা গেল। অনেক অনেকবার বললেও মথুরা আর বিয়ে করল না। বললো, না, বিয়ে আর করব না। সবার কপালে সব সুখ সহ্য হয় না। তা ছাড়া সৌতেলী মা এসে যদি পান্নাকে না দেখতে পারে, তাহলে……

একবার ভেবেছিল রেল কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে শঙ্করগড় ফিরে যাবে কিন্তু ওর সাহেব বারণ করলেন, চাকরি ছেড়ো না মথুরা। এখানে কাজকর্মের ভিতর দিয়ে দিনটা ঠিকই কেটে যাবে। তা ছাড়া সব চাইতে বড় কথা সব সময় মেয়েকে চোখের সামনে রাখতে পারবে।

যারা ঢোল বাজিয়ে সন্ধ্যার পর গান গাইতে আসতো, তারাও বললো, সাহেব ঠিকই বলেছেন। গাঁওতে গিয়ে ক্ষেতে কাজ করতে হলে পান্নাকে কে দেখবে ?

মথুরা চাকরি ছাড়ল না।

মথুরা ছোট্ট পান্নাকে কাঁধের ওপর নিয়ে সবুজ পাখা দেখালেই ড্রাইভার-ফায়ারম্যান ছাড়াও গার্ড-সাহেব পর্যন্ত হাত না নেড়ে পারতেন না। কখনও কখনও কোন কোন ড্রাইভার-ফায়ারম্যান বা গার্ড-সাহেব পান্নার জন্য এক প্যাকেট বিস্কুট ছুঁড়ে দিতেন। তারপর পান্না যখন একটু বড় হলো, তখন মথুরার হাত থেকে সবুজ পাখা কেড়ে নিয়ে

নিজেই নাড়াতো। পান্নাকে সবুজ পাখা নাড়তে দেখলে পার্সেল এক্সপ্রেসের ড্রাইভার সাহেব ভীষণ খুশী হতেন। গাড়ী না থামলেও স্পীড কমবেই। ড্রাইভার হরিশ্চন্দ্র চিৎকার করতেন, পান্না বেটি, আমার সঙ্গে ইঞ্জিন চালাবি না ?

পান্না জবাব দেবার আগেই গাড়ী বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতো! পান্না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতো।

হরিশ্চন্দ্র ড্রাইভারের পার্সেল এক্সপ্রেসের মত দিনগুলোও আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। পান্না বড় হলো। গয়ার এক ফায়ারম্যান মনোহর লালের সঙ্গে বিয়ে হলো। তারপর পান্না আরো বড় হবার পর একদিন গহনা পরে রাজরানী সেজে মনোহর লালের সঙ্গে সংসার করতে গেল।

মথুরা ইচ্ছা করলেও ছুটি নিয়ে মেয়ের কাছে যাবার বিশেষ সুযোগ পেতো না। ড্রাইভার-ফায়ারম্যানদের থেকেই মেয়ের খবর পেতো। খবর পেতো পান্না ভাল আছে। বেশ কয়েক মাস পরে খবর এলো পান্না বড় মাস্টার সাহেবের বাংলোয় কাজ করছে। মথুরা শুনে কিছু বললো না কিন্তু মনে মনে একটু অবাক হলো। মনোহর লালের বাবা নেই, মা নেই। একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেছে বহুকাল আগে। মনোহর লাল রেল কোম্পানী থেকে ভাল মাইনে পায়। তার উপর মোটা ওভার-টাইম। মাত্র দুটি প্রাণীর সংসার। এখনও তো ছেলেমেয়ে হয় নি। তা হলে পান্নার স্টেশনমাস্টারের বাংলোয় কাজ করার কি এমন প্রয়োজন হলো ? মথুরা অনেক ভেবেও কোন কারণ খুঁজে পেল না। শেষ পর্যন্ত একবার মেয়েকে দেখার জন্য গয়া চলে গেল।

পান্না হাসতে হাসতে বললো, কিছু চিন্তার নেই বাবুজী। তোমার দামাদের ডিউটির কোন ঠিকঠিকানা নেই। আমি একলা একলা কি ভাবে থাকি বল তো ?

তা তো ঠিকই।

তা ছাড়া আমাদের আশেপাশের লোকগুলো তত সুবিধের নয়।···

তাই নাকি ?

হ্যাঁ বাবুজী।

তা হঠাৎ বড় মাস্টারজীর বাংলোয়······

পান্না আবার হাসে। বলে, বড় মাস্টারজীর মেয়ে কমাস আগে এখানে এসেছিল। ওর ছোট্ট ছেলেটা আমাদের সামনের মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতো। আস্তে আস্তে ঐ-বাচ্চাটার সঙ্গে আমার খুব প্যার হয়ে গেল।···

তারপর ?

আমি মাঝে মাঝেই বড় মাস্টারজীর বাংলোয় যেতাম। ওর বিবি আমাকে খুব ভালবাসেন। তাই উনি যখন বললেন, পান্না, একলা একলা বাড়ীতে বসে না থেকে আমার এখানেই থাকিস। পান্না একবার মথুরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি আর আপত্তি করলাম না।

মথুরা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বললো, ভালই করেছিস।

পান্না আর কিছু বললো না, জানাল না। মথুরা ঐটুকু জেনেই ফিরে গেল।

বছরে এক-আধবার যাতায়াত থাকলেও মথুরা কিছু বুঝতে পারে নি। পান্না কিছু জানায় নি। মথুরা দুঃখ পাবে বলে পান্না নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করে নি। কটা বছর অদৃষ্টের বিরুদ্ধে একলা যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পান্না হেরে গেল। হরিশ্চন্দ্র ড্রাইভারের পার্শেল এক্সপ্রেস চেপে একদিন পান্না কাঁদতে কাঁদতে মথুরার কাছে ফিরে এলো।

জাপানী পুতুলের মতো মথুরা লাল-সবুজ পাখা নেড়েছে, আলো দেখিয়েছে, গেট বন্ধ করেছে, খুলে দিয়েছে কিন্তু দুটি দিন কথা বলতে

পারে নি কারুর সঙ্গে। শোকে দুঃখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। অনেক ড্রাইভার-ফায়ারম্যানই একটু-আধটু মদ খায়। মদ না খেলে বুঝি ঐ আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিউটি দেওয়া যায় না কিন্তু তাই বলে বাড়ীতে বসে মাতলামী বদমাইসী? কি বললি পান্না, ঐ হতচ্ছাড়াটার আরো একটা বউ আছে? তোকে ঘরে থাকতেও দিতো না? মারধর করতো? তোর বাচ্চা হয় নি বেশ হয়েছে। ঐ রকম মাতাল-বদমাইস বাপের ছেলে না হওয়াই ভাল। কেউটের বাচ্চা তো কেউটেই হবে। দু-দিন পরে সে হারামজাদাও তোকে ছোবল মারতো। কাঁদিস না বেটি, কাঁদিস না। আমিই তো তোর বুড়ো ছেলে। তোর আর ছেলের দরকার নেই।

পান্না মুখে কিছু বলে না। শুধু চোখের জল ফেলে।

মথুরা গামছা দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, কাঁদিস না বেটি, কাঁদিস না। তুই তো কোন অন্যায় করিস নি, তুই কাঁদবি কেন?

হাটুর উপর মুখ রেখে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পান্না একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ইচ্ছা করে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দেয় কিন্তু বুড়ো বাবার জন্য এক ফোঁটা জলও ফেলে না। ফেলতে পারে না। অবাধ্য মন চুপ করে থাকতে চায় না। কত কথা মনে পড়ে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম স্বামী ওকে সত্যি ভালবাসতো। ডিউটি থেকে ফিরে আসার সময় ওর জন্য রোজ কিছু না কিছু আনবেই। পান্না নিজেই কত দিন বলেছে, আমি কি বাচ্চা যে রোজ রোজ আমার জন্য কিছু না আনলে আমি রাগ করব?

মনোহর লাল তেল-কালি মাখা দুটো হাত দিয়েই ওকে জড়িয়ে ধরে বলতো, বেশ করব। বারণ করলে আরো বেশী করে আনব। তারপর একটু হেসে পান্নার মুখের উপর মুখ রেখে বলতো, যাকে প্যার করা যায়, তাকে যত দেওয়া যায় তত বেশী আনন্দ।

পান্না লজ্জায় মুখ নীচু করে খুশীর হাসি হাসে।

মনোহর লালের আবেগ থামে না। বলে, আমি যখন ট্রেনের ড্রাইভার হবো তখন তোমাকে রানী বানিয়ে দেবো।

পান্না মথুরার সামনে আর বসতে পারে না। উঠে যায়। সংসারের কাজে হাত দেয়। সব্জী কাটে, রান্না করে, ঘরদোর পরিষ্কার করে। বাপ বেটির সংসার হলেও কাজ কি কম? পান্না সারা দিনই ব্যস্ত থাকে কিন্তু মুহূর্তের অবকাশ পেলেই মনোহর লাল ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। কত কথা, কত কাহিনী, কত স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। কতদিন মনোহর লাল চোরের মত পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে ওকে হঠাৎ কোলে তুলে নিয়েছে। ভয়ে পান্না চিৎকার করতেই মনোহর লাল ছোট্ট বাচ্চার মত হো হো করে হেসে উঠত।

তুমি বড় বেসরম! খুশীর হাসি চেপে রেখে পান্না অনুযোগ করতো।

কেন?

দরজা খুলে রেখে কেউ এ ভাবে......

ওকে পুরো কথা বলতে না দিয়েই মনোহর লাল বলে, আমি ফায়ারম্যান বলে কি আমার বিবিকে আদর করব না?

তাই বলে এই সাত সকালে খোলা দরজার সামনে?

আমি আমার বিবিকে সব সময় আদর করব। তাতে কোন শালার কি?

মাঝে মাঝে পান্নার মনে ভাদ্দরের কালো মেঘে ভরে যায়। ঝর ঝর করে চোখের জল পড়ে। মনে মনে বলে, আমার স্বামী খারাপ ছিল না কিন্তু ঐ হারামজাদা মতিই ওর সর্বনাশ করল। নিজে তাতাতাড়ি ড্রাইভার হবে বলে আমার স্বামীকে মাতাল-বদমাইস করে দিল।

স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে হলেও পান্না মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায়।

দেখতে দেখতে আরো কটা বছর কেটে গেল। মথুরা রিটায়ার করল। বাপ বেটি চলে এলো শঙ্করগড়। হাজার হোক, গণ্ডগ্রাম। প্রথম প্রথম অনেকেই অনেক কিছু বলাবলি করছিল কিন্তু পান্না নিজেকে এমন গুটিয়ে রাখতো যে আস্তে আস্তে সমস্ত গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল। মথুরা ক্ষেত-খামারে একটু-আধটু কাজ করতো। রেল কোম্পানীর পেন্সন তো ছিলই। বাপ বেটির সংসার বেশ চলে যেতো। পান্না আস্তে আস্তে ছবির মত সংসারটি গুছিয়ে তুললো। একদিন যারা ওর সমালোচনা করতো, যারা আশঙ্কা করতো স্বামী পরিত্যক্তা সোমত্ত মেয়ের জন্য অনেক সুখের সংসারেই অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে, তারাও সংসারের কাজ সেরে পান্নার কাছে এসে রেলগাড়ীর গল্প, গয়ার বড় সাহেবের বাড়ীর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতো।

আচ্ছা পান্না, গয়া দিয়ে কটা রেলগাড়ী যায়?

পান্না হাতের উপর মুখ রেখে গম্ভীর হয়ে বলে, কত রেলগাড়ী যায় তা কি আমি গুনে রেখেছি?

এত রেলগাড়ী যায়?

তবে কি? দশ-পনের মিনিট পর পরই এক-একটা রেলগাড়ী আসছে-যাচ্ছে।

দশ-পনের মিনিট পর পর?

গয়া কি মামুলি স্টেশন আছে যে সারা দিনে একটা-দুটো গাড়ী আসবে? বোধ হয় এক ডজনেরও বেশী ডাক গাড়ী যায়।

শঙ্করগড়ের মেয়েরা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। একজন জিজ্ঞাসা করল, ডাক গাড়ী এলে তুই বুঝতে পারতি?

পারব না কেন? আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারতাম কোনটা ডাক গাড়ী আর কোনটা প্যাসেঞ্জার।

ডাক গাড়ীর আওয়াজ বুঝি আলাদা?

পান্না চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, এক মাইল লম্বা একটা রেলগাড়ী যদি হাওয়াই জাহাজের মত ছুটে আসে, তাহলে তার আওয়াজ আলাদা হবে না?

সম্মতিতে সবাই মাথা নাড়ে।

পান্না গম্ভীর হয়ে বলে, এমন রেলগাড়ীও গয়া দিয়ে যাতায়াত করে যাতে গর্মি বা ঠাণ্ডা লাগে না।

একসঙ্গে তিন-চারজনে প্রশ্ন করে, সে কি?

অতি অভিজ্ঞ মাস্টারমশাইয়ের মত পান্না বলে যায়, পুরো গাড়ীটা কাঁচ দিয়ে বন্ধ। গর্মির দিনে ভিতরে ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডার দিনে গরম।

আরো কত গল্প বলে পান্না। রেলের গল্প, ইঞ্জিনের গল্প, রেলের সাহেবদের গল্প।

ভগবতী জিজ্ঞাসা করে, তুই ইঞ্জিন দেখেছিস?

দেখেছি মানে! কত বার চড়েছি।

তোকে ইঞ্জিনে চড়তে দিত?

আমি তো হরিশ্চন্দ্র চাচার ইঞ্জিনে চড়েই বাবুজীর কাছে যেতাম। তা ছাড়া আলম চাচা আমাকে দু-তিনবার ডাক গাড়ীর ইঞ্জিনে চড়িয়েছে।

তোর ভয় করতো না?

ভয় করবে কেন?

রেলের সাহেবদের দেখলে তোর ভয় করতো?

ওরা কি বাঘ-ভাল্লুক যে ভয় করবো? বড় সাহেবের কোঠিতে তো হরদম কত সাহেব আসতো। আর আমিই তো খানা খেতে দিতাম।

যারা এককালে পান্নাকে নিয়ে আজেবাজে আলোচনা করেছে তারাই ওর কাছে গল্প শুনে বিমুগ্ধ মনে ঘরে ফিরতো।

মথুরার কাছে তো সারা গ্রামের মানুষ ছাড়াও আশেপাশের গ্রামের বহু পরিচিত মানুষই আসতো নানা বিষয়ে পরামর্শ নিতে। আসবে না কেন ? এতকাল ধরে যে রেল কোম্পানীর চাকরি করেছে, যে ইচ্ছে করলেই রেলগাড়ী থামাতে পারতো, যাকে রেল কোম্পানী পাকা বাড়ী দিয়েছিল তার কাছে তো পরামর্শ নিতে আসবেই। এক কথায় গ্রামের সব ব্যাপারেই মথুরাকে সব চাইতে আগে এগিয়ে আসতে হতো।

এই সিমেণ্ট কোম্পানীর সাহেবরা যেদিন প্রথম শঙ্করগড় এলেন সেদিনও গ্রামের সবাই মথুরা প্রসাদকে এগিয়ে দিয়েছিল।

হাত জোড় করে নমস্কার করে বিজয় কেজরিওয়াল বলেছিলেন, নমস্তে বড় চাচা, আমি কলকাতা থেকে এসেছি।

কলকাত্তা তো বহুত বড় শহর। সেখান থেকে এই গরীবদের এখানে এলেন কেন সাহেব ?

বড় চাচা, আমার খুব ইচ্ছে এই গ্রামকেও আমি শহর বানাব, পাকা মোকান বানাব, বিজলী বাতী আনব, ফ্যাক্টরী বানাব।··· ···

মথুরা প্রসাদ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল এত গ্রাম থাকতে এই গ্রাম কেন পছন্দ হলো আপনার ?

এখানকার কর্তাব্যক্তিরা আমার পিতাজীর বহুকালের দোস্ত। ওঁরা বলছিলেন এই অঞ্চলে সিমেণ্ট তৈরীর কারখানা হবার অনেক সুবিধা আছে। তাই······

কিন্তু কারখানা হলে আমরা কোথায় যাব সাহেব ? আমরা ক্ষেত-খামারের······

কিচ্ছু চিন্তা করো না বড় চাচা। শুধু তোমাদের এই শঙ্করগড়ের মানুষকে না, আশেপাশের গ্রামের সবাইকেও আমার কারখানায় নোকরি দেব, পাকা মোকানে থাকতে দেব, বিনা পয়সায় ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বলবে।

সাহেবদের মোটরগাড়ীর চারপাশে মেয়ে-পুরুষ,কাচ্চা-বাচ্চার ভীড় জমে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে মেয়ে-পুরুষের দল মথুরার পাশে এসে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল। হঠাৎ গ্রামের সমস্ত মানুষকে স্তম্ভিত করে পান্না জিজ্ঞাসা করল; সাহেব, আমি একটা কথা জানতে পারি?

বিজয়বাবুও একটু অবাক হলেন। একটু মুচকি হেসে বললেন, বল কি জানতে চাও?

এ গ্রামের মেয়েরাও ক্ষেত-খামারে কাজ করে, রোজগার করে। ক্ষেত-খামারের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে এই সব মেয়েরা কি করবে?

বিজয়বাবু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিও কি ক্ষেত-খামারে কাজ কর?

আমি ক্ষেত-খামারের কাজ জানি না?

তুমি কি কাজ জান?

আমি বড় সাহেবদের বাংলো বাড়ীর সব কাজ জানি।

তাই নাকি?

এবার পান্না কিছু বলার আগে মথুরা প্রাসাদ গর্বের হাসি হাসতে হাসতে বললো, গয়ার বড় মাস্টার সাহেবের কোঠিতে ও অনেক কাল কাজ করেছে। ও সব রকমের খানা বানান থেকে শুরু করে বড় বড় কোঠির সব কাজ.......

বিজয়বাবু ঐটুকু শুনেই বললেন, তা হলে তো ও আমার বাড়ীতেই কাজ করতে পারবে।

মথুরা চমকে ওঠে, কলকাত্তায়!

না, না। এখানে যে বাড়ী বানাব, সেখানে......

জরুর, জরুর।

পান্না জিজ্ঞাসা করল, গ্রামের অন্য মেয়েরা......

বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, আমার ফ্যাক্টরী হলে অনেক গ্রামের মেয়ে-পুরুষরাই কাজ পাবে।

শঙ্করগড়ের মানুষ প্রথমে বিশ্বাস করে নি। সন্দেহ করেছিল হয়তো কলকাতার এই সাহেব জমি কিনে ওদের সবাইকে তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু মাসখানেক পরেই বিজয় কেজরিওয়াল যখন আবার মোটরগাড়ী চড়ে লোকজন সঙ্গে নিয়ে এলেন তখন সন্দেহ করার কোন অবকাশই রইল না।

বড় চাচা, ইনি হচ্ছেন সেনগুপ্ত সাহেব। কলকাত্তার খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার।

মথুরা প্রসাদ হাত জোড় করে নমস্কার করল, নমস্তে সাব!

নমস্কার!

বড় চাচা, সামনের মাসের দশ তারিখ থেকেই রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী তৈরীর কাজ শুরু হবে। লোকজনের অভাবে যেন সেনগুপ্ত সাহেবের কোন অসুবিধা না হয়।

আরে সাব, দরকার হলে দশ গাঁও-এর লোক টেনে আনব।

সত্যি দশ গ্রামের লোক টেনে এনেছিল মথুরা প্রসাদ। মেয়ে-পুরুষ সবাইকে। গণ্ডগ্রাম শঙ্করগড় এক বছরের মধ্যে ঝকঝকে সুন্দর ছোট্ট একটা শহর হয়ে গেল। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, ইলেকট্রিসিটি ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস; এমন কি এই ছোট্ট নতুন শহরের অফিসে-বাড়ীতে টেলিফোন পর্যন্ত এসে গেল। প্রথম দিন যখন টেলিফোন চালু হলো সেদিন শঙ্করগড়ের সবাই চমকে উঠল। মেশিন কথা বলে? ঠিক মানুষের মত কথা শোনে, জবাব দেয়? পান্না গম্ভীর হয়ে বললো, আমার বড় সাহেবের কোঠিতেও এই টেলিফুন মেশিন ছিল: ঘেন্টি বাজলেই আমি কথা বলতাম।

কৌশল্যা বললো, তোর ডর লাগত না?

ডর কেন লাগবে?

মাগার……

পান্না একটু থামে। একটু হাসে। তারপর বলে, প্রথম দিন

টেলিফোনের ঘেন্টি শুনে আমি সত্যি ভয় পেয়েছিলাম। তারপর যখন দেখলাম এই মেশিনে কথা বলা হয় তখন আর ভয় করতো না।

কৌশল্যা জিজ্ঞাসা করল, ঐ মেশিনে কি কথা বলে ?

যা খুশী।

যা খুশী মানে ?

বড় সাহেব স্টেশন থেকে কোঠিতে আসার আগে রোজ টেলিফোন করতেন।—

কেন ?

ঐ সময় টেলিফোনের ঘেন্টি বাজলেই মেমসাহেব বলতেন, ছাখ ত পান্না, বোধ হয় বড় সাহেবের ফোন। তারপর আমি টেলিফোন তুলতেই বুঝতাম বড় সাহেব।

বড় সাহেব কি বলতেন ?

স্টেশনে বেশী কাজ থাকলে বলতেন, পান্না জলদি খানা দে। আমি আসছি। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে আমি টেবিলে খানা সাজাতাম।

কৌশল্যা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, টেবিলে ?

একটু হেসে পান্না জবাব দেয়, বড় বড় সাহেবদের কোঠিতে টেবিল-চেয়ারে বসেই খানাপিনা হয়।

তাই নাকি ?

তবে কি ওরা আমাদের মত মাটিতে বসে খাবে ? তা ছাড়া কোট-প্যাণ্টলুন পরে কি মাটিতে বসা যায়।

এদিকে এক কোনায় কেজরিওয়াল সাহেবের কোঠি তৈরী হচ্ছে ওদিকে এগিয়ে চলেছে ফ্যাক্টরীর কাজকর্ম। দিনে, রাত্রে। হাজার হাজার বিজলী বাতির সামনে সারা রাত ধরে কাজ হচ্ছে। কলকাতা থেকে বিজয়বাবু আবার এলেন কাজকর্ম দেখতে। রাত্রে সেনগুপ্ত সাহেবের আস্তানায় খেতে বসে বিজয়বাবু চমকে উঠলেন, এখানে এ সব খাবারের ব্যবস্থা করলেন কি করে ?

কেন ! পান্নাই তো আছে।

পান্না !

হ্যাঁ। মথুরার মেয়ে।

তাই নাকি ? মথুরার মেয়ে এত ভাল রান্না করতে পারে ?

মিঃ সেনগুপ্ত হাসতে হাসতে বললেন, আমিও আগে বিশ্বাস করি নি। আমি কলকাতা ফিরে গেলে আপনি বরং একে আপনার বাংলোতেই রেখে দেবেন।

এ রকম একজন লোকই তো আমার দরকার। কলকাতার বাড়ীর লোক আনলে তো মাছ-মাংস টাচ করবে না।

পান্না দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনেছে। এবার সেনগুপ্ত সাহেব ডাক দিতেই সামনে এলো জী সাব।

তোর রান্না বড় সাহেবের খুব ভাল লেগেছে। আমি তো কদিন পরেই চলে যাব। তখন তুই বড় সাহেবের কুঠিতে কাজ করতে পারবি ?

পান্না মুখ নীচু করে মাথা নাড়ল।

বিজয়বাবু একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মাছ-মাংস খাও ?

পান্না মাথা নেড়ে জানাল, না।

নিজে খাও না অথচ এত ভাল রান্না করতে পারো ?

পান্না কিছু বলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মিঃ সেনগুপ্ত বললেন, ও বিশেষ কিছুই খায় না। তাই তো যা রান্না করে জোর করে সব আমাকে খাওয়াবে।

এবার বিজয়বাবু বললেন, আমার কোঠিতে মাঝে মাঝে পার্টি হবে। তুমি সব ব্যবস্থা করতে পারবে ত ?

পান্না অত্যন্ত নীচু গলায় বললো, আশা করি পারব।

মিঃ সেনগুপ্ত বললেন, সব চাইতে বড় কথা শী ইজ ভেরী অনেস্ট। হানড্রেড পার্সেণ্ট অনেস্ট।

বিজয়বাবু বললেন, তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

আমার কোঠিতে কাজ করতে হলে ঐ গুণটা না থাকলে ত একেবারেই চলবে না।

না, না, আপনার কিছু চিন্তার কারণ নেই। পান্না একাই সব সামলাতে পারবে।

আপনার বাড়ী যখন সামলাচ্ছে তখন আমার বাড়ীও সামলাতে পারবে। যাক একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

আযোধ্যা সিমেণ্ট কোম্পানীর যাত্রা শুরু হলো। বিরাট লম্বা চিমনিটা জীবন্ত হয়ে আকাশের কোলে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল আলো। প্রাণচঞ্চল হলো সমগ্র এলাকা। আস্তে আস্তে রাত গভীর হয়। শঙ্করগড়ের ক্লান্ত মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত কর্মীর দল। জেগে আছে ফ্যাক্টরীর কর্মীরা। ওদের কাছে দিন-রাত্রের প্রভেদ নেই। আর জেগে আছে মথুরা প্রসাদ। দেহটা যত লম্বা চওড়াই হোক, মথুরা এখন বৃদ্ধ। রেল কোম্পানী থেকে রিটায়ার করার পরও বেশ কটা বছর পার হয়ে গেছে। এই পৃথিবীতে আর কত দিনই বা ওর মেয়াদ। হঠাৎ পিছন ফিরে না তাকিয়ে পারল না।

কত কি ভাবছিল মথুরা। নিজের কথা পান্নার কথা, শঙ্করগড়ের কথা, বিজয়বাবুর কথা, সেনগুপ্ত সাহেবের কথা, লাটসাহেব-মুখ্যমন্ত্রীর কথা। আরো কত কি। ছোট্ট গ্রাম শঙ্করগড় পঁচিশ-তিরিশ ঘর বাসিন্দা ঐ পাহাড়ের মত উঁচু মাটির ঢিপিতে এককালে বুঝি ভগবান শঙ্করের মন্দির ছিল। এখনও শিবরাত্রির দিন চারপাশের গ্রামের

মেয়েরা পূজা করতে আসে। ছোট্ট একটা মেলা বসে। বছরের ঐ একটা দিনই বাইরের কিছু লোকজন এ গ্রামে আসতো। আর এখন ?

রেল কোম্পানীর মত এই সিমেণ্ট কোম্পানীতেও কত জায়গার কত লোক ! বাপরে বাপ ! কেউ কি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে সারা হিন্দুস্থানের বড় বড় শহরের সাহেবরাও একদিন শঙ্করগড়ে এসে থাকবে ? কেউ কি কোন দিন ভাবতে পেরেছিল লাটসায়েব এখানে আসবেন ? মুখ্যমন্ত্রী আসবেন ?

না, কেউ ভাবে নি। কল্পনা করে নি আরো অনেক কিছু। এত কাল রেল কোম্পানীতে চাকরি করেও মথুরা ভাবতে পারে নি সে লাটসাহেব মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়াবে ; তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে আর ফটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ-লাইটের আলোয় সে প্রতি মুহূর্তে চমকে উঠবে। না, কোন দিন কোন কারণে এ সৌভাগ্য ও আশা করে নি। শঙ্করগড়ের কোন মানুষই এ সব সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখে নি। মথুরা মনে মনে ভাবে, মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন, শঙ্করগড়ে ইনকিলাব এসেছে। তাইতো সে মনে মনে বলে ইনকিলাব, জিন্দাবাদ !

এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই মথুরা ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে পান্নার মাকে। মথুরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছে। আর যেন দেহটাকে টানতে পারছে না। পান্নার মা বলছে, আর তোমাকে খাটতে হবে না। এবার এসো, একটু বিশ্রাম নাও। মথুরা বলে, তুমি বললেই কি বিশ্রাম নিতে পারি ? আমি বিশ্রাম নিলে পান্নাকে কে দেখবে।

পান্নার মা হাসে।

হাসছ কেন ?

হাসব না ? পান্নার কথা তোমাকে আর ভাবতে হবে না। তুমি চলে এসো ; বিশ্রাম কর।

মথুরা চিৎকার করে ওঠে, তুমি বললেই আমি পান্নাকে ছেড়ে চলে যাব ?

পান্না তাড়াতাড়ি ছুটে যায় মথুরার কাছে, কি হয়েছে বাবুজী ? তুমি ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠলে কেন ?

চিৎকার করেছিলাম নাকি ?

তবে কী ?

মথুরা আর কোন কথা বলে না। পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু পান্নার চোখে আর ঘুম আসে না। জানলা দিয়ে দূরের বড় কোঠির দিকে চেয়ে থাকে আর নিজের জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করে।

দুই

কারখানার সাদা ধবধবে লম্বা চিমনিটা আস্তে আস্তে কালো হতে শুরু করল। রোজ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই খাটিয়ায় বসে বসেই মথুরা আপন মনে ঐ চিমনিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। উদাস হয়ে যায়। কি যেন ভাবে। ভাবতে ভাবতে মুখের চেহারা বদলে যায়। একটু করুণ বিষণ্ণতার আভা লাগে চোখের কোনায়। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। জিজ্ঞাসা করলেও বলে না। বলে, নারে বেটি, কিচ্ছু ভাবছি না।

পান্না তর্ক করে না। সকালবেলায় কথাবার্তা বলার ওর সময় থাকে না। তবে মনে মনে স্পষ্ট বুঝতে পারে, জানতে পারে !

সংসারের কাজকর্ম সেরে বড় কোঠি যাবার সময়ও পান্না রোজ ওকে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে। একটু অবাক হয়। কিন্তু কোন প্রশ্ন করে না। শুধু বলে, বাবুজী, যাচ্ছি।

অধিকাংশ দিনই মথুরা শুধু বলে, আচ্ছা বেটি।

নটার সাইরেন বেজে গেছে। পান্না আর দাঁড়ায় না। মাথার ঘোমটা টানতে টানতে চলে যায়।

কোন কোন দিন মন-মেজাজ ভাল থাকলে মথুরা দুটা একটা পরামর্শ দেয়, বেটি, খুব সাবধানে কাজ করিস। দেখিস, কোন জিনিসপত্তর যেন এদিক-ওদিক না হয়।

পান্না একটু হাসতে হাসতে বলে, জিনিসপত্তর এদিক-ওদিক হবে কেন ?

ওরে বেটি, কথায় বলে, সিন্দুক খোলা থাকলে সাধুর মনও চঞ্চল হয়। হাজার হোক, কোটিপতির বাড়ী !

বুড়ো বাবার কথায় ও একটু অসন্তুষ্ট হয়। অসন্তোষ প্রকাশ না করে বলে, তোমার ভয় নেই বাবুজী; আমার দ্বারা বড় সাহেবের কোন ক্ষতি হবে না।

মথুরা একগাল হাসি হেসে বলে, তা জানি বলেই তো তোকে ওখানে কাজ করতে দিয়েছি। মেয়েকে একটু কাছে টেনে সস্নেহে মাথায় হাত দিতে দিতে বলে, হাজার হোক, কোটিপতির কোঠি। কত লাখ লাখ টাকা খর্চা করে বানিয়েছেন, সামান কিনেছেন। সবই তো তোর উপর বিশ্বাস করে...

জানি।

মথুরা তার অভিমানী মেয়েকে চেনে। তাই বললো, তা আমি ভাল করেই জানি। তবে কি জানিস বেটি, এ সব বড়লোকের কোঠিতে কাজ করতে হলে খুব হুশিয়ার থাকতে হয়। বাইরের কোন লোকে কি করে দেবে কিন্তু শেষে দোষ হয় বাড়ীর কর্মচারীদের।

পান্না গর্বের সঙ্গে বলে, বড় সাহেবের কামরায় আমি ছাড়া আর কেউ যেতেই পারে না।

ইলেক্‌ট্রিক বা টেলিফোনের লোকজন ত যাবেই।

বাইরের কেউ গেলে সব সময় আমি দাঁড়িয়ে থাকি। তা ছাড়া আমি না বললে কোন আলতু-ফালতু লোককে দারোয়ানজী কোঠির ভিতরেই ঢুকতে দেবে না।

দু-একদিন বাপ বেটির অন্য কথাবার্তাও হয়। মথুরা জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে বেটি, বড় সাহেব কেমন লোক রে?

সত্যি বাবুজী বড় সাহেবের মত লোক হয় না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ বাবুজী, অত বড়লোক কিন্তু কোন দেমাগ নেই। অত্যন্ত ভদ্র-সভ্য লোক।

তা ত হবেই। বড় সাহেব কত লেখাপড়া করেছেন। তা ছাড়া ভদ্র-সভ্য না হলে কেউ এত বড় বড় কারখানা চালাতে পারে?

তা ত বটেই।

আচ্ছা বেটি, বড় সাহেবের খাওয়া-দাওয়ার কোন ঝামেলা আছে নাকি?

পান্না একটু হেসে বলে, বড় সাহেবদের কলকাতার বাড়ী মাছ-মাংস হয় না কিন্তু বাঙ্গালীদের মত উনি মাছ-মাংস খুব ভাল বাসেন। তাই এখানে থাকলে রোজ মাছ-মাংস চাই-ই।

আচ্ছা? একটু থেমে মথুরা জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে বড় সাহেব নেশা করেন?

তুমি কি বলছ বাবুজী? বড় সাহেব পান-সিগরেটও খান না। পান্না একটু থেমে বলে। অন্তত আমি কোন দিন দেখি নি। যদি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে খান তা হলে আমি বলতে পারব না।

নেশা করলে তুই ঠিকই জানতে পারতি।

পান্না বুড়ো বাপের হুঁকো ঠিক করতে করতে বলে, জান বাবুজী, বড় সাহেব তোমাকে খুব ইজ্জত করেন।

বুড়ো মথুরা একটু খুশীর হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করে, কি করে বুঝলি।

উনি ত সব সময় সবার কাছে তোমার প্রশংসা করেন। উনি অনেক দিন খেতে বসেও আমাকে বলেন······

কি বলেন।

বলেন, তোমার বাবার মত সাচ্চা আদমী খুব কম হয়।

বুড়ো মথুরা হুঁকো টানতে শুরু করলেই পান্না বড় কোঠির দিকে রওনা হয়, চলি বাবুজী।

যা বেটি, আর দেরী করিস না।

কারখানা চালু হবার পর পান্না যখন বিজয়বাবুর কোঠিতে কাজ শুরু করল, তখন ওকে শুধু রান্না করতে হতো। বাকি সব কিছু

করতো ঘনশ্যাম। কলকাতা থেকে বিজয়বাবুর সঙ্গে এসেছিল। ঘনশ্যাম ঘরদোর পরিষ্কার করত, বিছানা-পত্তর ঠিক করত, টেলিফোন ধরত, সাহেবকে খেতে দিত। দিনে দারোয়ান, রাত্রে চৌকিদার বড় গেট পাহারা দিত। পাহারা দেওয়া ছাড়া এক কথায় বড় কোঠির সব কিছুই ঘনশ্যাম দেখতো। দরকার হলে অফিসে টেলিফোন করে বলতো ঘোষবাবু নমস্কার! আমি ঘনশ্যাম বলছি।

বল ঘনশ্যাম কী ব্যাপার।

এক নম্বর কথা হচ্ছে বর্মনবাবুকে একটু বলবেন বড় সাহেবের শোবার ঘরের এয়ার-কণ্ডিশনার বড় আওয়াজ করছে। বর্মনবাবু ব্যস্ত থাকলে অন্য কাউকে যেন পাঠিয়ে দেন।

বর্মনবাবু পাওয়ার-হাউস থেকে ফিরে এলেই বলব।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বাজার যাব। একটা গাড়ী চাই।

কখন?

যখন সুবিধে হয়। বড় সাহেব তো কাল আসছেন। তাই বিকেলের মধ্যে বাজার করলেই হবে।

তাহলে তিনটের পর দেওকী নন্দনকে পাঠিয়ে দেব।

দেওকী নন্দনের নাম শুনেই ঘনশ্যাম হাসে।

ঘোষবাবু জিজ্ঞাসা করেন, কি হল ঘনশ্যাম হাসছ কেন?

আরে ঘোষবাবু দেওকী নন্দনের গাড়ীতে মাছ-মাংস নিলেই বড় বকবক করে। চিকেন নিলে তো কথাই নেই। খালি বলবে, ছি ছি! বড় সাহেব এই সব খান···

তাই নাকি?

হ্যাঁ ঘোষবাবু। আমি ওকে হাজার বার বলেও বিশ্বাস করাতে পারলাম না কলকাতার অনেকেই বাড়ীর বাইরে সব কিছুই খায়।

নামে বড় কোঠি হলেও বাড়ীটি বড় নয়। নীচের তলায় শুধু একটা হল। সফা আর কার্পেট দিয়ে সুন্দর করে সাজান। হলের

একপাশ দিয়ে উপরে যাবার সিঁড়ি। উপরে একপাশে ড্রইংরুম। অন্যদিকে পাশাপাশি দুখানা শুবার ঘর। সামনে কোন বারান্দা নেই কিন্তু পিছন দিকে বিরাট বারান্দা। সেখানে বেতের সোফা সেট। বারান্দার এক কোনার দিকে কিচেন আর স্টোর। আর স্টোরের ওপাশে সারভেন্টস কোয়ার্টার। ঘনশ্যাম ওখানেই থাকে। বড় সাহেব সুইচ টিপলেই ওর ঘরে একটা বড় লাল আলো জ্বলে। সঙ্গে একটু মিষ্টি বাজনা।

ঘনশ্যাম রোজ দু-বেলা ঘরদোর পরিষ্কার করে। প্রত্যেকটা সুইচ টিপে দেখে আলো জ্বলছে কিনা, গিজার আর এয়ার-কণ্ডিশনার ঠিক আছে নাকি। কোন কিছু গণ্ডগোল হলেই হ্যালো ঘোষবাবু!

বিজয়বাবু থাকলে ঘনশ্যাম পান্নাকে বলে, দুটো টোস্ট, দুটো ফ্রায়েড এগ্ আর কফি হবে ব্রেকফাস্টের জন্য। পান্না খাবার-দাবার তৈরী করলেও ঘনশ্যাম সাহেবকে খেতে দেয়। দুপুরবেলা দু-চারজনের জন্য বেশী রান্না হয়। ঘনশ্যাম জানে বড় সাহেব কখন কাকে খেতে বলেন তার ঠিক নেই। রাত্রে বড় সাহেব অফিসে কাজ করেন সাড়ে সাতটা-আটটা পর্যন্ত। তাই তখন আর কেউ ওর সঙ্গে আসেন না। রাত্রে বড় সাহেব কোঠিতে আসার একটু পরেই পান্না বাড়ী যায়।

প্রথম প্রথম এই ভাবেই চলতো। আসতে আসতে ঘনশ্যাম পান্নাকে অন্যান্য কাজকর্ম শেখাতে শুরু করল। এই মেশিনে পানি গরম হয়। একে বলে গিজার। এই সুইচটা টিপলেই মেশিনে একটা লাল আলো জ্বলছে?

হ্যাঁ।

ঐ লাল আলো জ্বলছে মানেই বুঝতে হবে পানি গরম হওয়া শুরু করেছে। বড় সাহেব আসার এক-দুই ঘণ্টা আগেই এই মেশিন চালাতে হয়। স্নান করার জন্য গরম জল তৈরী না থাকলে বড় সাহেব ভীষণ রেগে যান।

তাই নাকি ?

তবে কি ? ঘনশ্যাম আরো বলে যায়, পানি গরম হবার পর এই বাথ-টাবে গরম আর ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে তৈরী করে রাখতে হবে।

ঘনশ্যাম কোন ত্রুটি রাখে না। বাথ-টাবে ঠাণ্ডা গরম জল মিশিয়ে দেখিয়ে দেয়। এবার কোথায় কোন সাবান, কোন তোয়ালে, কোথায় শেভিং সেট, দাঁত মাজার পেস্ট-ব্রাশ, ওডিকোলন, সেণ্ট, চিরুনি ব্রাশ ইত্যাদি ইত্যাদি কি ভাবে রাখতে হবে তুলতে হবে—সব কিছু দেখায়।

এই মেশিনে কামরা ঠাণ্ডা হয়।

জানি।

এই মেশিনও বড় সাহেব আসার দু-ঘণ্টা আগে চালু করতে হয়। না হলে কামরা ঠাণ্ডা হবে না। কামরা টাণ্ডা না হলে বড় সাহেবের নীদ আসবে না।

তা হলে পাঙ্খা চালু রাখার কি দরকার ?

আস্তে আস্তে পাঙ্খা ঘুরলে কামরার সব জায়গা ভাল ঠাণ্ডা হয়।

বড় কোঠি আর বড় সাহেবকে দেখাশুনার সব কিছু বুঝাবার পর বুড়ো ঘনশ্যাম একটু মুচকি হেসে বললো, আর যা কিছু দরকার হবে তা বড় সাহেবই বুঝিয়ে দেবেন।

তার মানে ?

মানে বড় সাহেব যদি অন্য কিছু খেতে-টেতে চান, তা হলে উনিই বলে দেবেন কি ভাবে কি করতে হবে।

এর পর ঘনশ্যাম একদিন বড় সাহেবের সঙ্গেই কলকাতা চলে গেল। যাবার সময় পান্নাকে শুধু বললো বত্রিশ সাল কলকাতায় কাটাবার পর এখানে কি আমি থাকতে পারি ?

ঘনশ্যামের পরিবর্তে কলকাতা থেকে কেউ এলো না। বড় কোঠির ভার নিল পান্না।

বড় সাহেব না থাকলে সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসে। বড়

সাহেব থাকলে যেতে হয় ভোরবেলায় আর বাড়ী ফিরতেও রাত হয়। বড় সাহেব সাধারণত দু-একদিন থেকেই চলে যান। কখনো কখনো তার বেশী। তবে মাসে দুবার আসবেনই। জরুরী কাজ থাকলে আসা-যাওয়া বেড়ে যায়।

বিজয়বাবুর বয়স বেশী নয়। তিরিশ-বত্রিশ হবে। তার বেশী কিছুতেই নয়। যেমন রূপ তেমন স্বাস্থ্য। অমানুষিক পরিশ্রম করেন। কিছু না হলেও দশ-বারো ঘণ্টা কাজ করেনই। কলকাতার কথা পান্না জানে না কিন্তু শঙ্করগড়ে এলে উনি যা পরিশ্রম করেন তা দেখে ও অবাক হয়। ছটায় ঘুম থেকে উঠে সাতটার মধ্যেই স্নান সেরে পান্নাকে ডাক দেন।

জী সাব!

নাস্তা লাগাও।

দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই ব্রেকফাস্ট তৈরী করে পান্না বড় সাহেবের ড্রইংরুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, বড়ো সাব নাস্তা এখানেই আনব নাকি বারান্দায়....

এখানেই দাও।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেই দু-তিনবার টেলিফোন আসে কলকাতা থেকে। লাল টেলিফোনে কথা শেষ হতে না হতেই বিজয়বাবু কালো টেলিফোনের ডায়াল ঘুরান, নমস্কার বৌদি, মিঃ রায় আছেন!

একটু ধরুন, এক্ষুণি দিচ্ছি।

বিজয়বাবু টেলিফোন ধরে থাকেন শুনতে পান, শুনছ খোকনবাবু-তোমাকে ডাকছেন।

মিঃ রায় অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর জেনারেল-ম্যানেজার। এখানে আসার আগে বিজয়বাবুদের পেপার মিলের জেনারেল-ম্যানেজার ছিলেন ষোল বছর। তার আগে বজবজের ফ্যাক্টরীতে

ছিলেন ছ-বছর। ওদের মত পুরনো কর্মচারীরা বিজয়বাবুকে খোকনবাবু বলেই চেনেন, জানেন।

গুড মর্নিং বি কে!

মর্নিং।

কলকাতা থেকে ফোন এসেছিল?

হ্যাঁ কিন্তু ওরা জয়পুর থেকে এখনও কোন খবর পায় নি।

জিপসামের যা স্টক পজিশান তাতে তো আর দেরী হলে কারখানা চালানই মুশকিল হবে।

তাই বলছি আপনি বরং কাউকে এক্ষুণি জয়পুর পাঠিয়ে দিন। দরকার হলে কিছু খরচ করেও অর্ডারটা হাতেই আনতে হবে।

ঠিক আছে। আমি এক্ষুণি গোস্বামীকে বলছি।

আর একটা কথা।

বলুন।

কাল রাত্রে রেডিওতে শুনলাম মোগলসরাই ইয়ার্ডে বটলনেক হয়েছে। আমাদের ওয়াগনগুলো যদি মোগলসরাইতে আটকে যায় তা হলে পি-আর-ও'কে এক্ষুণি একটা খবর দিন ভাল করে বিজ্ঞাপন দিতে।

মিঃ রায় শুধু বললেন, আচ্ছা।

দুপুরে লাঞ্চ খেতে এসে মিঃ রায় টেলিফোনে খবর পেলেন ওদের সিমেন্ট বোঝাই প্রায় একশ ওয়াগন মোগলসরাই ইয়ার্ডে আটকে পড়েছে। বাড়ী থেকেই কলকাতা অফিসের পাবলিক রিলেসান্স অফিসারকে খবর দিলেন, এক্ষুণি বিজ্ঞাপন দিন।

মিসেস রায় শুনে অবাক, কিগো তোমাদের সিমেন্ট পাওয়া যাবে না তবু বিজ্ঞাপন দিতে বললে।

হ্যাঁ।

হ্যাঁ মানে?

তুমি এ সব বুঝবে না।

কিন্তু সিমেন্ট দিতে পারবে না জেনেও বিজ্ঞাপন দিতে বললে কেন। ঐ বিজ্ঞাপন দেখে তো আরো বেশী লোক বেশী করে সিমেন্ট চাইবে।

বেশী লোক সিমেন্ট চাইবে বলেই তো বিজ্ঞাপন দিতে বললাম।

কিন্তু কেন।

স্ত্রীর প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হয়ে মিঃ রায় বলেই ফেললেন ওরে বাবা এই সব মওকায়ই তো কোম্পানী বেশ কিছু কামিয়ে নেয়। বস্তা পিছু যদি পাঁচ টাকা করেও কোম্পানীর ঘরে বেশী আসে তাহলেও কয়েক দিনেই বিশ-পঁচিশ লাখ এসে যাবে।

হা ভগবান! বেশী দামে বিক্রী করবে বলে এত বিজ্ঞাপন দিতে বললে।

তোমাকে এ সব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না।

পান্না বিজয়বাবুর এ সব ব্যবসা বুদ্ধির খবর রাখে না। সে শুধু দেখে বড় সাহেব সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পরিশ্রম করেন, বড় সাহেব সব সময় চিন্তিত। এক মিনিটের ফুরসত নেই বড় সাহেবের।

ঘনশ্যাম দাদার কাছে পান্না বড় সাহেবের বাড়ীর গল্প শুনেছে। বিজয়বাবুর বাবা-মা ছাড়া নব্বই বছরের ঠাকুমা এখনও জীবিত। কাকারা অন্য বাড়াতে থাকলেও বিজয়বাবুরা পাঁচ ভাই বাবা-মা-ঠাকুমার কাছেই থাকেন। বিরাট তিনতলা বাড়ী। শুধু বাড়ীর জন্যই এক ডজন মোটরগাড়ী আছে।

পান্না চমকে ওঠে এক ডজন!

ঘনশ্যাম হাসতে হাসতে বলে কলকাত্তার বাড়ীতে এক ডজন গাড়ীতেও অসুবিধা হয়।

কেন?

প্রত্যেক সাহেব আর বিবিজীর আলাদা আলাদা মোটরগাড়ী।

ওদেরই এক ডজন লাগে। তাই তো বাড়ীর কাজের জন্য রোজ অফিসের গাড়ী চাইতে হয়।

শুনেই পান্নার চোখ ছানাবড়া হয়।

ঘনশ্যাম গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করে সাহেবের বাড়ীতে কত নোকর-নোকরানী আর ড্রাইভার আছে জান?

কত?

বাইশ জন।

বিশ, একশ, বাইশ?

হ্যাঁ হ্যাঁ বাইশ।

একটু চুপ করে থেকে পান্না জিজ্ঞাসা করে বড় সাহেবদের অনেক টাকা আছে তাই না?

ঘনশ্যাম হাসতে হাসতে বলে, সাহেবদের এগারটা কারখানা আছে। তার মধ্যে এই সিমেন্ট কারখানা সব চাইতে ছোট।

পান্না একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে পারে না। একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা সাহেব কখনও বিবি-বাচ্চাকে নিয়ে আসেন না কেন?

বুড়ী মা পছন্দ করেন না।

কেন?

বাড়ীর সবাই যখন যান তখন বিবিজীরাও যান। এই কারখানা যখন চালু হলো সেদিন আসার কথা ছিল কিন্তু বুড়ী মার শরীর খারাপ হবার জন্য আসা হলো না।

বড়ো সাহেবের কটা বাচ্চা?

একটা লেড়কা।

লেড়কা কত বড়?

পাঁচ-ছ সালের হবে।

কথায় কথায় ঘনশ্যাম বলে, এই সাহেবকে নাগপুরের কয়লার

খনি বোম্বাইতে কাপড়ের কলও দেখতে হয়। মাসে সাত-আট দিনের বেশী কলকাতাতে থাকতেই পারেন না।

বড় সাহেব একলা একলাই ঘুরে বেড়ান?

হ্যাঁ।

একলা একলা এত ঘুরতে ভাল লাগে?

ঘনশ্যাম হাসে। বলে, বড়লোকেরা টাকার নেশায় সব কিছু করতে পারে।

তাই বলে মাসে বিশ-বাইশদিন একলা একলা ঘুরে বেড়ান?

সাহেবদের তিন ভাইকে খুব ঘুরতে হয়।

অন্য দু-ভাই?

ওরা কলকাতার বড় অফিসে থাকেন।

বড় সাহেবের কথা শুনে পান্না একটু বিষণ্ণ হয়। দুঃখ পায় অবসর সময় বড় সাহেবের কথা ভাবে। কখনও কখনও বাড়ীতে গিয়ে মথুরাকে বড় সাহেবের কথা বলে, জান বাবুজী, এখানকার কারখানা ছাড়াও বড় সাহেবকে নাগপুর আর বোমবাইয়ের কারখানা দেখতে হয়। মাসের মধ্যে বিশ-বাইশদিন ওকে ঘুরে বেড়াতে হয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বড় সাহেব সাত-আটদিনের বেশী কলকাতায় থাকতে পারেন না।

কোটিপতি আদমীরা কি আমাদের মত বাড়ীতে বসে থাকতে পারে?

শুধু মথুরার কাছে নয়, পুরনো বান্ধবীদের কাছেও পান্না বড় সাহেবের গল্প শোনায়। লছমী, কৌশল্যা, রামপেয়ারী মুগ্ধ হয়ে শোনে। ওরাও পান্নার কাছে বড় সাহেবের নানা কথা জানতে চায়।

রামপেয়ারী বললো, বড় সাহেব খুব ঠাণ্ডা আদমী, তাই না?

হ্যাঁ। বড় সাহেব ভীষণ কম কথা বলেন।

গত মাসে বড় সাহেব পাওয়ার-হাউস দেখে ক্যান্টিনের রসুই দেখতে এসেছিলেন।

তাই নাকি? পান্না হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ। আমরা তো অবাক।

একলাই গিয়েছিলেন?

না, সঙ্গে বর্মন সাহেব ছিলেন।

তারপর তোরা কি করলি।

ব্যানার্জীবাবু ইসারা করতেই আমি বড় সাহেবকে মিঠাই খেতে দিলাম।

খেলেন?

শুধু একটা বরফি তুলে নিলেন।

পান্না গম্ভীর হয়ে বললো, বড় সাহেব মিঠাই খান না!

তবে বড় সাহেব বলেছেন একদিন ক্যানন্টিনে খাবেন।

তা খেতে পারেন। কোটিপতি হলেও বড় সাহেব খুব সাদাসিধে আদমী। বিশেষ করে খানাপিনার ব্যাপারে কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

ওরা তিনজনে এক সঙ্গে বলে, আচ্ছা!

শুধু পান্না, লছমী, কৌশল্যা বা রামপেয়ারী নয়, শঙ্করগড়ের সমস্ত মানুষ অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর ছোট-বড় কর্মচারীই বড় সাহেবকে শ্রদ্ধা করেন। ভালবাসেন। ওঁরা সবাই জানেন এই একটা মানুষের জন্য এতগুলো মানুষের অদৃষ্ট বদলে গেছে। শঙ্করগড়ের যারা এর আগে বজরার দুখানা মোটা রুটি আর এক লোটা জল খেয়ে দিন কাটাত, তারাও আজকাল রোজ বিকেলে থলি নিয়ে বাজার যায়। আটা, গম, শাকসব্জী কেনে। শরীর খারাপ হলে ডিসপেন্সারীতে যায়।

নমস্কার ডক্টর সাব।

তোমার আবার কি হলো? দেখে ত মনে হচ্ছে ভালই আছো।

কিষাণ একটু হেসে বলে, আমি ঠিক আছি মাগার বিবির তবিয়ত ভাল নেই।

সে কোথায়?

বাহার।

ভিতরে ডাক দাও।

পুষ্পা ভিতরে আসতেই ডাক্তার রায়চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেন, শরীর খারাপ হয়েছে?

জী।

কি হয়েছে?

কাম করতে ইচ্ছা করে না। রুটি খেতেও দিল লাগে না।

ভিতরের ঘরে যাও। আমি আসছি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার সাহেব ভিতরে যান। পুষ্পাকে পরীক্ষা করেন। একটু পরেই বাইরে বেরিয়ে এসে কিষাণকে বলেন, ওর শরীর ঠিকই আছে তবে বাচ্চা হবে।

কিষাণ আর পুষ্পা ডাক্তারখানা থেকে কতকগুলো ট্যাবলেট আর এক শিশি ওষুধ নিয়ে হাসতে হাসতে কোয়ার্টারে ফিরে যায়।

আগে?

দু-পাঁচ বছর পর পরই শঙ্করগড়ের ভাগ্যাকাশ জমাট বাধা অন্ধকার মেঘে ঢাকা পড়েছে। এসেছে মহামারী। কখনও কলেরা, কখনও বসন্ত। অথবা অন্য কিছু। হাহাকার করে উঠেছে সারা গ্রামের মানুষ। প্রায় প্রতিটি পরিবারকে দু-একজনকে হারাতে হয়েছে কিন্তু ডাক্তার? সে ত শহরের বড়লোকদের জন্য। শঙ্করগড়ের গরীব মানুষ ডাক্তার দেখবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

এই মথুরা কি এমনি এমনি গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। পাঁচ

বছরের মধ্যে ছটি ভাইবোন আর বাবা-মাকে হারাবার পর ও আর শঙ্করগড়ে থাকতে পারে নি। পালিয়েছিল। আর পালিয়েছিল বলেই ভাগ্যক্রমে মিত্র সাহেবের অনুগ্রহে রেল কোম্পানীতে চাকরি পেল।

শঙ্করগড়ে এমন কোন পরিবার নেই যারা মহামারীর কবলে দু-এক-জন হারায় নি। তা না হলে কি শঙ্করগড়ের এই চেহারা হয়? মহা-বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এরা শুধু শঙ্করনাথের বটতলায় পূজা দিতো আর পাশের গ্রামের কিশোরীলাল ওঝার কাছে ছুটে যেতো।

শঙ্করগড়ের দুঃখের ইতিহাসের যেন শেষ নেই। অন্যের ক্ষেত-খামারে কাজ করে দুখানা শুকনো বজরার রুটি পেটে পড়লেও আর কোন সৌভাগ্যের স্বাদ পেত না এখানকার মানুষ! ধুলিগাঁওতে স্কুল খুললে অনেকেই ছেলেদের নিয়ে ছুটেছিল কিন্তু মাসে মাসে আট আনা মাইনে কে দেবে? সবাই ফিরে এল। শঙ্করগড়ের মানুষের সঙ্গে সরস্বতীর পরিচয় হলো না। শতখানেক টাকা খরচ করার সামর্থ্য থাকলে কত মেয়ের কপালে সুপাত্র জুটত কিন্তু যে গ্রামের মানুষ দশ টাকার নোট দেখতে পায় না, তার মেয়ের বিয়েতে শতখানেক টাকা ব্যয় করবে কেমন করে?

বছরকয়েক আগে মাল বোঝাই একটা লরী জি. টি. রোডের ধারে উল্টে গিয়েছিল। শঙ্করগড়ের মানুষ ছুটে গিয়ে লরীকে টেনে তুলে আবার মাল বোঝাই করেছিল। লরীর ড্রাইভার সবাইকে পাঁচটা করে টাকা দিয়েছিল। কিষাণও পেয়েছিল। শঙ্করনাথের মেলায় খরচ করবে বলে সবাই সে টাকা এক বছর লুকিয়ে রেখেছিল। আর এখন?

শনিবার বিকেলে অফিসের খাতায় টিপ সই দিয়েই কিষাণ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ টাকা পায়। সঙ্গে সঙ্গে ও আর শুকদেব প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে যায় ধুলিগাঁও-এর বাজারে। অর্ধেক টাকার সরাব খেয়ে

অনেক রাত্রে ফিরে আসে। যারা নেশা করে না তারাও বাজার যায়। গামছা ভর্তি করে জিনিস কেনে, বিবিকে কাঁচের চুড়ি কিনে দেয়।

হীরা সৌখীন লোক। আগে রোজ রাত্রে ঢোল বাজিয়ে গান গাইতো। শঙ্করগড়ের একদল মানুষ ওর চারপাশে বসে ওর গান শুনত। এখনও হীরা গান গায়, তবে হারমোনিয়াম কিনেছে। কারখানার বন্ধুবান্ধবরা শুধু গান শোনে না, পেয়ালাভর্তি চা খায়। তুলসীদাসের ভজন শোনার জন্য মথুরা মাঝে মাঝে ওর ওখানে আসে। গান শোনে কিন্তু হীরার স্ত্রী চা দিতে এলেই বলে, সবে এক পেয়ালা চা খেয়েছি আর খাব না।

হীরা অনুরোধ করে, বড়ে চাচা, এক পেয়ালা চা খাও। কোন ক্ষতি হবে না।

না, না, হীরা, বেশী চা খাওয়া ভাল না।

চা খাবার সময় গান বন্ধ থাকে। নানা কথাবার্তা হয়। মথুরা বলে এককালে এই শঙ্করগড়ের মানুষ ভাল পানি পর্যন্ত পেত না কিন্তু এখন ?

শুনে হীরাও হাসে। বলে, সত্যি বড়ে চাচা। কবছর আগেও ভাবতে পারি নি আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইব।

মথুরা মাথা দুলিয়ে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছিলেন—এই হচ্ছে সব চাইতে বড় ক্রান্তি। একেই সাচমুচ ইনকিলাব বলে।

হীরা গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি ঠিকই বলেছ বড়ে চাচা কিন্তু হাতে পয়সা আসায় কিছু লোক খারাপও হয়ে যাচ্ছে।

আমি জানি হীরা, ধুলিগাঁও-এর বাজারে অনেকেই টাকা উড়িয়ে আসছে।

হ্যাঁ, বড়ে চাচা ঠিকই বলেছ।

ক্রান্তি যখন এসেছে তখন শুধু ভালই হবে, তার তো কোন মানে

নেই। কিছু খারাপ তো হবেই। মথুরা একটু শুকনো হাসি হেসে বলে প্রদীপের আলোয় ঘরের অন্ধকার দূর হলেও প্রদীপের নীচে একটু অন্ধকার থাকবেই।

শুধু হীরা নয় সবাই মাথা নেড়ে মথুরার কথায় সম্মতি জানায়।

চুনার পাহাড়ের কিছু দূর থেকে লাইমস্টোন আসছে, রাজস্থান থেকে জিপসাম আসছে, ঝরিয়া-রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা আসছে আর অযোধ্যা সিমেণ্ট ওয়াগন বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে চারদিকে। রোজ, প্রতিদিন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস। দেখতে দেখতে দুটো বছর পার হয়ে গেল। এখন আর শঙ্করনাথের মেলার জন্য শঙ্করগড়ের মানুষে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে না। শঙ্করনাথের মেলার চাইতে বোনাস পাওয়া অনেক আনন্দের।

সাদা ধবধবে লম্বা চিমনিটা আরো একটু কালো হলো।

মথুরা ভোরবেলায় উঠে ঐ চিমনিটার দিকে আজও তাকিয়ে আছে। পান্না পাশে এসে দাঁড়াল কিন্তু মথুরা টের পায় না। ও বিভোর হয়েই চিমনির দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাবুজী!

কিরে বেটি?

তুমি রোজ সকালে উঠে ঐ দিকে এ ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখ?

ঐ লম্বা চিমনিটা।

রোজ?

হ্যাঁ রোজ।

রোজ রোজ কি দেখ?

প্রথম যখন কারখানা হলো তখন এই বিরাট লম্বা চিমনিটা দেখে ভীষণ ভাল লাগতো। রাত্তিরবেলায় যখন ওর মাথায় লাল আলো

দেখতাম তখনই দূরের আউটার সিগন্যালের কথা মনে হতো কিন্তু হঠাৎ একদিন সাদা ধবধবে চিমনিটাকে কালো হতে দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

কেন? কারখানার চিমনি তো কালো হবেই।

তা জানি কিন্তু মনে হয় আমরাও বোধ হয় একটু একটু করে কালো হয়ে যাচ্ছি।

তার মানে?

তার মানে? মথুরা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, কারখানা হয়েছে বলে অনেক গরীব মানুষ খেতে পাচ্ছে, পাকা মোকানে থাকতে পারছে। নলের জল, বিজলির আলো ছাড়াও আরো কত কি পাচ্ছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু হারিয়েও যাচ্ছে।

কি হারিয়ে যাচ্ছে বাবুজী?

শঙ্করগড়ের মানুষগুলোও বদলে যাচ্ছে।

সে তো যাবেই বাবুজী!

যাবেই, তাই নারে বেটি? মথুরা আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

কিছু তো বদলে যাবেই বাবুজী।

বেটি তুইও বদলে যাবি?

পান্না চমকে ওঠে। আমি আর কি বদলাব?

পান্না আর কথা বলে না, চলে যায় কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারে বাবুজী ঠিকই বলেছে। শঙ্করগড়ের মানুষগুলো সত্যি বদলে যাচ্ছে। ঐ সাদা ধবধবে লম্বা চিমনিটার মত মানুষগুলোও একটু একটু করে কালো হচ্ছে। সারা দিন বড় কোঠিতে কাটালেও পান্না শুনেছে কদিন আগে কিষাণ মদ খেয়ে শুকদেবের বউকে নিয়ে টানাটানি করেছে, জানাজানি হবার পর পুষ্পা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওয়ার্কার্স কলোনীর সবাইকে জানিয়ে দিল, ঐ হারামজাদীই তো আমার

আদমীর বারোটা বাজিয়েছে। ও ডাইনী টাকা পেলে সব করতে পারে।

শুকদেবের বউও চুপ করে থাকে নি, আরে চুপ চুপ! নিজের আদমীকে ধরে রাখতে পারিস না আবার চ্যাঁচাচ্ছিস?

কিষাণ বরাবরই এই ধরনের। সুযোগ পেলেই গ্রামের মেয়েদের বিরক্ত করতো। মথুরা রিটায়ার করার পর পান্না যখন শঙ্করগড় এলো তখন কারণে-অকারণে প্রায়ই কিষাণ আসতো, বড়ে চাচা আছেন?

নেই। কই কাম থা?

কিষাণ বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, কাম তো থা…

জরুরী কিছু?

ও সে কথার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, ফিরবেন কখন?

ঠিক জানি না।

আমি বরং একটু বসি।

পান্না আপত্তি করে না। কিষাণ বাইরের চারপেয়ীতে বসে থাকে কিন্তু বেশীক্ষণ না। একটু পরেই ঘরের দরজার কাছে এসে পান্নাকে জিজ্ঞাসা করতো, আমি বাইরে একলা একলা চুপচাপ বসে থাকব?

আমি যে খানা বানাচ্ছি।

খানা তো পরেও বানাতে পারিস। হঠাৎ কিষাণ ঘরের মধ্যে ঢুকে বললো, এখানে বসি?

পান্না একটু অবাক হয়। বলে ঘরে কেন? বাইরে তো বেশ হাওয়া আছে।

কিষাণ একটু হেসে বলে, ঐ হাওয়াতে কি আমার দিল ঠাণ্ডা হয়?

সব্জী কাটতে কাটতে পান্না চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে বলে, তার মানে?

আবার সেই মুখ টিপে হাসি হাসতে হাসতে ও জবাব দেয়, বাইরের হাওয়ার চাইতে তোর কাছে বসলেই আমার দিল বেশী ঠাণ্ডা হবে।

পান্না গর্জে ওঠে, যা। বাহার যা।

রাগ করছিস কেন? একলা একলা তোর যেমন ভাল লাগে না তেমনি আমারও ভাল লাগে না।

সব্জী কাটা ছেড়ে পান্না তেড়ে আসতেই কিষাণ বেরিয়ে যায় কিন্তু আবার দু-চারদিন পরেই উদয় হয়।

বড় পিয়াস লেগেছে। একটু পানি দিবি পান্না?

না।

কেন?

গঙ্গার সমস্ত পানি খেলেও তোর পিয়াস যাবে না।

নির্লজের হাসি হেসে কিষাণ বলে, তুই তাহলে বুঝেছিস?

না তা কেন বুঝব?

তাহলে এ পিয়াস মিটাবি তো?

পান্না আর সহ্য করতে পারে না। ঝাঁটা হাতে করে তেড়ে এসে বলে ঝাড় পিটিয়ে তোর পিয়াস মেটাব।

নির্লজ্জ, বেহায়া, বদমাইস কিষাণ সুযোগ পেলেই পান্নাকে আবার বিরক্ত করেছে। ঘরে-বাইরে। শঙ্করনাথের মেলায়। তারপর একদিন কৌশল্যাদের বাড়ী থেকে ফেরার পথে বটগাছের আরাল থেকে কিষাণ নেকড়ে বাঘের মত হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরতেই পান্না আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে নি। হাতের দুটো আখ দিয়ে এমন মার মেরেছিল যে কিষাণ আর কোন দিন পান্নার দিকে হাত বাড়াতে সাহস করে নি। এখন কিষাণের সঙ্গে দেখা হলেই পান্না মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করে, আমার ভালবাসার কথা ভুলে যাস নি তো?

কিষাণ জবাব দেয় না। চোরের মত মুখ নীচু করে চলে যায়।

পান্না অতি সাধারণ গুমটিম্যানের মেয়ে। লেখাপড়া শেখে নি।

অধিকার বা অনধিকারের তত্ত্ব সে জানে না কিন্তু প্রকৃতি তাকে শিখিয়েছে মৌমাছিরই ফুলের মধু খাবার অধিকার বা যোগ্যতা আছে, বোলতার নেই। সেই মৌমাছিকে মধু দেবার জন্যই সে মনোহর লালের সংসারে গিয়েছিল কিন্তু স্বামীর সোহাগ পাওয়া যখন তার অদৃষ্টে জুটল না তখন আস্তে আস্তে লুকিয়ে-চুরিয়ে বোলতা আসতে শুরু করল। রাত একটু গভীর হলেই পিছনের দরজায় ঠুক্‌ঠুক্‌ করে আওয়াজ হতো। প্রথম প্রথম পান্না ঠিক বুঝত না; ভাবতো বোধ হয় কুকুর-বেড়াল এসেছে। দু-চারদিন পরে আরো গভীর আবার সেই আওয়াজ! বিছানা ছেড়ে উঠতে পান্নার ভয় করছিল। জেগে জেগেই শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটু পরে আবার সেই আওয়াজ ঠুক্‌ঠুক্‌। এবার না উঠে পারল না। ভাবল, বোধ হয় হীরামতীর বাচ্চাটার জ্বর নিশ্চয়ই বেড়েছে। বোধ হয় সেজন্যই ডাকাডাকি করছে। ওর স্বামীও তো মনোহর লালের মতনই আরেক গুণধর! হতচ্ছাড়া হয়তো বাড়ীই ফেরে নি।

ঘরের লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে বারান্দায় রেখে দরজার কাছে গিয়ে পান্না জিজ্ঞাসা করল, কে? হীরামতী? বাচ্চার বুখার বেড়েছে নাকি?

দরজার ওপাশ থেকে একটা আওয়াজ এলো কিন্তু ঠিক কি বললো তা বুঝতে না পারলেও পান্না ভাবল হীরামতীই এসেছে। পান্না দরজা খুলতেই অবাক। কালো কালো দাঁত বের করে হাসছে ড্রাইভার কেদার নাথ! চিৎকার করতে পারল না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে বাধা পেল।

একলা একলা তোর ডর লাগছে না? পরমাত্মীয়ের মত কেদার নাথ আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল।

একলা একলা থাকব কোন দুঃখে?

কেন মিছে কথা বলছিস পান্না? মনোহর লাল তো……

ওর কথাটা শেষ করবার আগেই পান্না ফিসফিস করে বললো, স্টেশনের এক বাবু আছে। কাল আসিস।

সাচ?

ঝুট বলে আমার কি লাভ? আমি যে একলা একলা রাত কাটাতে পারি না তা কি তুই জানিস না?

কেদার দরজার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে পান্নার থুতনি নেড়ে বললো, ছি ছি! তুই একলা থাকবি কেন?

এখন যা। কাল আসিস।

কাল যদি আবার স্টেশনের বাবু আসে?

আমি কি বাবুর কেনা গোলাম যে রোজ রোজ......

তাহলে কাল আসব?

জরুর, কিন্তু তাড়াতাড়ি আসবি। বেশী রাত হলে......

না, না, বেশী রাত করব না।

এখন যা। বাবু টের পেলে...

আচ্ছা যাচ্ছি।

দরজা বন্ধ করতে করতে পান্না বললো, আর কিছু না পারিস আমার জন্য কাঁচের চুড়ি আনিস।

জরুর, জরুর।

পরের দিন তো দূরের কথা, কেদার নাথ ড্রাইভার কোন দিনই সে চুড়ি দিতে পারল না।

আমাদের সমাজব্যবস্থা সত্যি বড় বিচিত্র। ঘরে অকর্মণ্য, অপদার্থ দুশ্চরিত্র রোগগ্রস্ত স্বামী থাকলে মেয়েদের বিপদ নেই কিন্তু ঘর শূন্য হলেই কোন না কোন কেদার নাথের উৎপাতের হাত থেকে রেহাই নেই। চোরের মত চুপি চুপি কেউ না কেউ মনের দরজায়, দেহের জানলায় উঁকি-ঝুঁকি দেবেই। কিষাণকে দেখলেই পান্নার এই সব কথা মনে পড়ে।

পান্না মনে মনে হাসে। ভাবে, সব পুরুষগুলোই কি একই ধাতুতে তৈরী? শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গরীব-বড়লোক সবাই কি একই রোগে ভুগছে? মনে পড়ে গয়ার বড় মাস্টার সাহেবের কথা। বড় সাহেব কত লেখাপড়া জানতেন। গড়গড় করে আংরেজি বলতেন সব সাহেবদের সঙ্গে। বুড়ো মানুষ। বিরাট লম্বা-চওড়া চেহারা। কথা বলা তো দূরের কথা, ওকে দেখলেই ভয় করতো। ছেলেমেয়েরা কত বড় হয়ে গেছে। তা ছাড়া কি ধার্মিক। রোজ সকালে উঠে স্নান সেরেই পূজার ঘরে ঘণ্টাখানেক না কাটিয়ে এক কাপ চা পর্যন্ত খেতেন না। অথচ সেই মানুষেরও কি নিদারুণ দুর্বলতা!

মনোহর লালের ঔদাসীন্য, অবিচার, অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পান্না যখন বড় সাহেবের বাংলোয় থাকতে শুরু করলো তখন ভাবল এবার নিশ্চিন্ত। হা ভগবান! বিবিজী বেরিলি গেলে একদিন মাঝরাতে স্বয়ং বুড়ো বড়ো সাহেব এসে হাজির ওর ঘরে!

বড়ে সাব আপ? স্তম্ভিত বিস্মিত হলেও অত্যন্ত চাপা গলায় পান্না জিজ্ঞাসা করল, তবিয়ত খারাপ লাগছে নাকি?

যে বড় স্টেশন মাস্টারের গর্জনে গয়ার সমস্ত রেল কর্মী ভয়ে কাঁপে তিনিই বেড়ালের মত মিউ মিউ করে বললেন, না, না, তবিয়ত ঠিকই আছে।....

তবে? কিছু দরকার আছে?

পা টিপে টিপে আমার ঘরে আসতে পারিস?

কিউ?

কিছুতেই নীদ আসছে না, তুই একটু আসবি?

এই নিস্তব্ধ অন্ধকার মধ্যরাত্রির আমন্ত্রণের অর্থ বুঝলেও না বলতে পারল না পান্না। বললো, আপনি যান আমি আসছি।

জলদি আয়, দেরী করিস না।

আপ যাইয়ে, আমি আসছি।

ঘরে যখন আগুন লাগে তখন ভীরু কাপুরুষ, দুর্বলও অকস্মাৎ অসুরের মত সাহসী ও শক্তিশালী হয়। অনেক অসম্ভব কাজও সে অনায়াসে করে। পান্নাও করল। বড় সাহেব চলে যাবার একটু পরেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে উন্মাদিনীর মত চিৎকার করে উঠল, বড়ে সাব, চোর! বড়ে সাব, চোর! চোর, চোর···

শুধু বড় সাহেব নয়, সে চিৎকারে বাড়ীর সবাই বেরিয়ে এলেন। আশেপাশের কোয়ার্টারেরও অনেকে জেগে গেলেন। এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করলেন সবাই কিন্তু চোরের হদিস পাওয়া গেল না। সবাই বললেন, পালিয়েছে! বাকি রাতটুকু সবাই সতর্ক হয়ে রইলেন। সে রাতে বড় সাহেবের মত বোলতাও পান্নার মধু খেতে পেলেন না, পারলেন না।

পরের দিন দুপুরবেলায় খেতে এসে পান্নাকে একলা পেয়ে বড় সাহেব অদ্ভুত ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ রাত্রেও চোর আসবে নাকি?

পান্না ভয়ে, লজ্জায় মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে কিছু বলে না।

আজ শোবার আগে বারান্দায় ওদিকের দরজা বন্ধ করে রাখবি, বুঝলি?

পান্না তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু মনে মনে বলে, এই সোজা কথাটা বোঝার বয়স আমার হয়েছে। আমি জানি বারান্দার ওদিকের দরজা বন্ধ রাখলে আপনি নির্বিবাদে আমার কাছে আসতে পারবেন। ও মনে মনে ভাবে বড় সাহেব তাহলে ওকে মুক্তি দেবেন না?

বড় সাহেব কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর আবার স্টেশনে চলে গেলেন। একটু পরেই খালাসী এসে চা নিয়ে গেল। এবার পান্না

সংসারের কাজে লেগে যায় কিন্তু বার বারই বড় সাহেবের কথাগুলো মনে পড়ে, আজ যদি ন্যাকামি করেছিস তাহলে তোর আমি বারোটা বাজিয়ে দেব। আর যদি আমার কথা মত কাজ করিস তাহলে তোকে…

ভাবতেও পান্নার ঘেন্না লাগে। আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুরিয়ে এলো। আলো জ্বলে উঠল বড় সাহেবের কোঠির ঘরে ঘরে। বড় সাহেবের ছেলেরা যে যার পড়তে বসল। পান্না রান্না শেষ করে ডাইনিং টেবিল পরিষ্কার করতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোন এলো। ও রিসিভার তোলার সঙ্গে সঙ্গেই ওদিক থেকে বড় সাহেবের গলা শুনতে পেল, কে ?

আমি পান্না।

রান্না হয়ে গেছে ?

জী সাব।

ছেলেদের আগে খেতে দিস। আমি পরে খাব।

আচ্ছা সাব।

অন্যদিনের চাইতে একটু দেরী করেই বড় সাহেব ফিরলেন। স্নান করলেন, পূজা করলেন। তারপর ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করলেন। বড় ছেলে খাবার কথা জিজ্ঞাসা করলে বললেন, বিশেষ ক্ষিদে নেই। তাই একটু রাত করে খাব। তোরা শুয়ে পড়।

এখন গরমকাল। ছেলেদের ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই কলেজ ছুটতে হয়। তাই ওরা রোজই নটা বাজতে না বাজতেই শুয়ে পড়ে। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হলো না।

পান্না রান্নাঘরের দোর গোড়ায় বসে বসে নিজের আসন্ন ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা ভাবছে। হঠাৎ বড় সাহেব ডাকলেন, 'পান্না।

পান্না বড় সাহেবের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, জী সাব।

দশটা বাজে। খেতে দে।

খাওয়া-দাওয়া মিটতে মিটতে আরো আধ ঘণ্টা লাগল। বড় সাহেব শুয়ে পড়লে পান্না রান্নাঘরের বাকি কাজকর্ম করতে গেল। রান্নাঘরের কাজ শেষ করে বেরুতেই ও দেখল বড় সাহেবের ঘরের টেবিল লাইট জ্বলছে না। পান্না স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ভাবল, উনি তাহলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিশ্চিন্ত মনে নিজের ঘরে ঢুকেই পান্না চমকে উঠল।

বড় সাহেব শক্ত হাতে পান্নার একটা হাত চেপে ধরে প্রায় ফিস-ফিস করে বললেন, চিৎকার করিস না। কাছে আয়।

পান্নার কাছে আসতে হলো না। বড় সাহেবই এক টানে ওকে কাছে টেনে নিলেন।

পান্না চোখের জল ফেলতে ফেলতে অস্ফুট স্বরে শেষবারের মত একবার আবেদন জানাল, বড়ে সাব, মেহেরবাণী করে……

ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক? বড় সাহেব দু-হাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোর কাছে শুতে এসেছি। তুই আমাকে একটু শুতে দিবি না?

বড়ে সাব!

তুই এখনও ভয় পাচ্ছিস? কিছু ভয় নেই। আমি তোকে কত আদর করব।

পান্না বড় সাহেবের দুটো পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মুক্তি চেয়েছিল কিন্তু পায় নি। বড় সাহেব পান্নাকে নিয়ে অন্ধকারের অতল গহ্বরে ডুব দিয়েছিলেন। শুধু সে রাত্রে নয়; দিনের পর দিন। বেরিলি থেকে নিজের স্ত্রী ফিরে আসার দিন পর্যন্ত বড় সাহেব পান্নার মধু খেয়েছিলেন। স্বামীর সোহাগ বঞ্চিত গরীব পান্নাকে মুখ বুজে এই অত্যাচার, এই গ্লানি সহ্য করতে হয়েছিল।

এ সব কথা পান্না কাউকে বলে নি। কোন মেয়েই কাউকে বলে

না। পান্না কিষাণকে শুধু বলেছিল, আমার কাছে—কালতু সময় নষ্ট না করে বরং রামপেয়ারীর কাছে যা।

অযোধ্যা সিমেণ্ট কোম্পানীর সাদা ধবধবে লম্বা চিমনিটা কালো হবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যি শঙ্করগড়ের মানুষগুলোও কালো হতে শুরু করল। বড় সাহেবের বাংলোয় সারা দিন কাটালেও পান্না সব খবর পায়। এখন আর কিষাণ, শুকদেব বা ওদের মত স্ফূর্তিবাজ লোকদের ধুলিগাঁও যেতে হয় না, রেলওয়ে সাইডিং-এর ওপাশেই সরাবের দোকান হয়েছে। দিনের বেলায় সব ফাঁকা কিন্তু সন্ধ্যার পর একটু অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল মানুষ মাছির মত ওখানে ভনভন করে। বড় কোঠিতে বসে বসেই পান্না মাঝে মাঝে তাদের চিৎকার উল্লাস শুনতে পায়। জানতে পায় আরো অনেক কাহিনী।

বড় সাহেবের শোবার ঘরের এয়ার-কণ্ডিশনারটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার পর পান্না ঘোষবাবুকে টেলিফোন করে বর্মনবাবুকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু বর্মনবাবু ব্যস্ত থাকায় দু-তিন দিন আসতে পারেন নি। ঘোষবাবু বলেছিলেন, বড় সাহেব তো এখন আসছেন না, বর্মনবাবুকে কদিন পরেই পাঠাব। পান্না আপত্তি করে নি। কদিন পরে চৌকিদার এসে পান্নাকে বললো, দিদি, ডিউটিতে আসার সময় বর্মনবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। বললেন, আজ বিকেলের দিকে আসবেন।

আচ্ছা।

চৌকিদার তবু দাঁড়িয়ে রইল। দু-চার পা এগিয়ে পান্না হঠাৎ পিছনে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আর কিছু বলবে ?

না তবে···। চৌকিদার কথাটা শেষ করতে পারল না।

তবে কি ?

চৌকিদার মুখ নীচু করে বললো, না, থাক।

পান্না বুঝল চৌকিদার কিছু বলতে দ্বিধা করছে। পিছিয়ে চৌকিদারের সামনে এসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কি এমন কথা যে বলতে তোমার বাধছে?

বলব?

বলবে না কেন?

দিদি, বর্মনবাবু এলে একটু সাবধানে থেকো।

তার মানে? পান্না অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

বুড়ো চৌকিদার মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, বলব? তুমি কিছু মনে করবে না তো?

না, না, কিচ্ছু মনে করবো না বল।

দিদি, বর্মনবাবু লোকটা তত সুবিধের নয়···মানে বিশেষ ভাল না।

কী, হয়েছে কি?

বর্মনবাবু দিনের বেলা ক্যান্টিনের খাবার খান, তা তো তুমি জান?

বোধ হয় কেউ যেন বলেছিল কিন্তু ক্যান্টিনে খান তো কী হয়েছে?

রামপেয়ারী রোজ ওকে পাওয়ার-হাউসে খাবার পৌছে দিতে যায় বলে—

ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য পান্না হাসতে হাসতে বললো, রামপেয়ারী যখন ক্যান্টিনে কাজ করে তখন তো ওকে খাবার পৌছতে যেতেই হবে।

তাতো হবে কিন্তু রামপেয়ারীর সঙ্গে বর্মনবাবু···

বুড়ো চৌকিদার কথাটা শেষ করতে না পারলেও ইঙ্গিতটা বুঝতে

পান্নার অসুবিধে হলো না। বললো, যার যা ইচ্ছে করুক তাতে আমাদের কি?

যাই হোক, বর্মনবাবু এলে তুমি সাবধানে থেকো।

পান্না হাসতে হাসতে বললো তুমি কি ভেবেছ আমিও রামপেয়ারী?

পান্না নিজের কাজে চলে গেলেও মনে মনে বুঝল চৌকিদার ঠিকই বলেছে। কৌশল্যার কাছে আগেই ও অনেক কিছু শুনেছিল। রামপেয়ারীর বিয়ে হলেও স্বামীর ঘর করতে হয় নি। ওর স্বামী বুঝি আমেদাবাদের এক কাপড়ের কলে কাজ করে। কিন্তু রামপেয়ারী তার কাছে যায় না, সেও রামপেয়ারীর কাছে আসে না। বাবা বেঁচে থাকতে তবু একটু ভয় করতো। কিন্তু সে মারা যাবার পর রাম-পেয়ারীর পাখনা গজিয়েছে। বুড়ী মাকে ও কোন কালেই গ্রাহ্য করতো না; অযোধ্যা কোম্পানীতে নোকরি পাবার পর তো কথাই নেই। কৌশল্যা নিজে চোখে প্রায়ই সন্ধ্যার পর রেল-লাইনের ওদিকে যেতে দেখেছে রামপেয়ারী আর বর্মনবাবুকে।

বর্মনবাবু চীফ ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজার। পাওয়ার-হাউসের পিছন দিকে ওর আলাদা অফিস। কাজের জন্য ওকে যেতে হয় সব জায়গা। কারখানার ভিতরে-বাইরে, সাহেবদের কোঠিতে, ওয়ার্কারদের কলোনীতে, অফিসে, ক্যান্টিনে, গুদামে। সর্বত্র। বড় সাহেব কলকাতা থেকে এনেছেন বলে এখানকার সবাই ওকে খাতির করেন। কেউ কেউ ভয়ও। হাজার হোক, বড় সাহেব ওকে পছন্দ করেন। যখন তখন বড় কোঠিতে যায়। একেবারে বড় সাহেবের শোবার ঘরে পর্যন্ত চলে যায়। সবই ঠিক, কিন্তু ওকে কোন কালেই পান্নার ভাল লাগে নি।

ঘনশ্যাম চলে যাবার মাসখানেক পরের কথা।

সেদিন সকালে বড় সাহেব আসবেন বলে পান্না খুব ব্যস্ত। ঘরদোর ঠিকঠাক করে রান্নাঘরের গোছগাছ শুরু করতে করতেই বেলা পড়ে গেল। আলোর সুইচ দিয়েও আলো জ্বলল না। পান্না তো অবাক। চারটের সময় অফিস বন্ধ হয়। তাই পাওয়ার-হাউসেই ফোন করল, বর্মনবাবু হ্যায় ?

নেই।

কাহাঁ বর্মনবাবু ?

কাকটোরীকা অন্দর।

আসবার সঙ্গে সঙ্গে বড় কোঠি আসতে বলো।

বর্মনবাবু এলেন কিন্তু ইতিমধ্যে পান্না আরো দুবার টেলিফোন করেছে, ঘণ্টাখানেক সময়ও পার হয়েছে।

অন্ধকার গাঢ় হবার পরই উনি এলেন। চৌকিদার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, দিদি, বর্মনবাবু এসেছেন।

পাঠিয়ে দাও।

সাধারণত সঙ্গে একজন মিস্ত্রী থাকে। কিন্তু সেদিন বর্মনবাবু একলাই এলেন। সিঁড়ির নীচের ধাপে পা দিয়েই বললেন, পান্না, টর্চ আছে ?

কেন, আপনার মিস্ত্রীর কাছে নেই ?

সব মিস্ত্রী কারখানার মধ্যে কাজ করছে। তুমি বার বার টেলিফোন করেছ শুনে…

কি করব ? কাল সকালেই যে বড় সাহেব…

বর্মনবাবু স্বগতোক্তি করলেন, আজ যে কি হল। সব জায়গাতেই গণ্ডগোল। তারপর বললেন, দেশলাই জ্বালতে পার ? কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

পান্না দেশলাই জেলে সিঁড়ির উপরে দাঁড়াতেই বর্মনবাবু, বললেন। অত উপরে দেশলাই জ্বাললে কি নীচে কিছু দেখা যায় ? একটু নীচে এসো।

সেই সেদিনই পান্না বর্মনবাবুকে চিনেছিল। বুঝেছিল, এর থেকে দূরে না থাকলে বিপদ আছে। সেই থেকেই ও সতর্ক থাকে। তবু বর্মনবাবু আকারে ইঙ্গিতে কথায়-বার্তায় তার মনের বাসনা চেপে রাখতে পারেন না।

জান পান্না, তোমাকে অনেকটা বাঙ্গালী মেয়েদের মত দেখতে।

ভাল কথা।

তারপর মাছ-মাংস রাঁধতে পার।

পান্না চুপ করে থাকে।

বর্মনবাবু চুপ করে থাকতে পারেন না। বলেন, আমাকে একদিন মাছ রান্না করে দিয়ে আসবে?

মাছ দিয়ে যাবেন, রান্না করে দেব।

কেন আমার কোয়ার্টারে গিয়ে রান্না করতে পারবে না?

না, তা হয় না।

কেন? কী হয়েছে? তুমিও সেদিন আমার ওখানেই খাবে।

পান্না হঠাৎ বলে, একটু বেশী রাত হয়ে গেলে আপনার ওখানে থাকতে পাব তো?

কিন্তু...

আমার এমন বদ অভ্যাস যে খাবার পরই শুয়ে পড়ি।

কিন্তু...

কিন্তু কি?

সত্যি তুমি...

আপনি যদি প্যার করে থাকতে বলেন তাহলে থাকব না কেন?

কিন্তু মথুরা ..

বলব, আপনার ওখানে ছিলাম।

না, না, তা হয় না।

তাহলে তো আমারও থাকা হবে না বর্মনবাবু। আমি আবার

ঝুট বলতে পারি না। পান্না মুচকি হাসতে হাসতে বললো, বিশেষ করে প্যার করার কথা কোন মেয়েই চেপে রাখতে পারে না।

একটু শুকনো হাসি হেসে বর্মনবাবু বললেন, তুমি ত আচ্ছা মেয়ে। বেশী সত্যি কথা বললে ত বড়ই মুশকিল।

পান্না হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, কেন? রামপেয়ারীকে দিয়ে কাজ হচ্ছে না?

বর্মনবাবু আর কথা বলতে পারেন নি।

পাকা আম যেমন হঠাৎ একদিন গাছ থেকে খসে পড়ে, মথুরাও তেমনি একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এই পৃথিবী থেকে চলে গেল।

কেউ ভাবতেই পারে নি মথুরা এ ভাবে চলে যাবে। রায় সাহেবের কামরার বাইরে বসে সারা দিন ডিউটি দিয়েছে, সন্ধ্যার পর হীরার ভজন শুনেছে। প্রতিদিনের মত পান্নার সঙ্গে গল্পও করল অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ একবার আর্তনাদ করেই খাটিয়ায় লুটিয়ে পড়ল। আরো জোরে আর্তনাদ করল পান্না। চারপাশের মানুষ ছুটে এল কমিনিটের মধ্যেই। ডাক্তারবাবুও এলেন কিন্তু তাকে ওষুধ ইনজেকশন দিতে হলো না। শুধু ডেথ সার্টিফিকেট লিখেই চলে গেলেন।

কাঁদতে কাঁদতে পান্না মূর্চ্ছা গেল। চোখের জল ফেলল শঙ্কর-গড়ের মানুষ। দুঃখ প্রকাশ করলেন কারখানার সাহেব-বাবু-কর্মীরা। কিন্তু ভোরের সূর্য দেখা দিতে না দিতেই শঙ্করগড়ের মাটিতে মথুরা মিশে গেল।

এই পৃথিবীতে সব অপ্রত্যাশিত ঘটনাই অস্বাভাবিক নয়। মৃত্যু তো কখনই নয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রত্যাশা করা যেতে পারে। মানুষের জীবনে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্যের চাইতেও মৃত্যু অনেক বেশী সত্য। স্বাভাবিক। অবশ্যম্ভাবী। তবু মানুষ

কাঁদে। আত্মহারা হয়, ব্যাকুল হয়, বিভ্রান্ত হয়। পান্নারও হলো। হবেই। এই পৃথিবীতে দিনে সূর্যের আলো, রাতে চাঁদের জ্যোৎস্না অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু পান্নার জীবনে তো শুধু মথুরাই আলো দিয়ে গেছে। সেই দীপশিখাটি যখন দমকা বাতাস ওঠার আগেই নিভে গেল তখন পান্নার কাছে সারা পৃথিবীটা অন্ধকার, প্রাণহীন জড়পিণ্ড মনে হলো। দুঃখের দিন, বিপর্যয়ের রাতে পৃথিবীকে যতই নির্মম, প্রাণহীন, বিষণ্ণ, করুণ মনে হোক না কেন, আস্তে আস্তে এই পৃথিবীরই রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, মাধুর্য মানুষকে আবার মোহমুগ্ধ করে। শোকাতুর মানুষ আবার উঠে দাঁড়ায়, জীবনের মুখোমুখি হয়। সে হাসে, খেলে, কর্তব্যপালন করে। দুংখের দিনে বিপদের দিনে অন্যকে সান্ত্বনা দেয়, সাহস দেয়।

জীবনধারাটা একটু পাল্টে গেল ঠিকই কিন্তু পান্না আবার বড় কোঠির হাল ধরল। হাজার হোক, অযোধ্যা সিমেণ্ট কোম্পানীর প্রথম কর্মচারী। বড় সাহেব মথুরার কোয়ার্টারে মথুরার স্মৃতিতে ওয়ার্কারদের জন্য একটা ক্লাব করে দিলেন। পান্না এখন বড় কোঠির সারভেন্টস কোয়ার্টারে থাকে। ব্যবস্থা বেশ ভালই। ছোট ছোট দুখানা ঘর ছাড়াও রান্নাঘর, স্নানের ঘর, পায়খানা আছে। এক দিক দিয়ে ভালই হলো। রোজ সকালে আর রাত্রে মাইলখানেক রাস্তা হাঁটাহাটি করার ঝামেলা রইল না। হঠাৎ কোন দরকার হলে দিনে দারোয়ান রাতে চৌকিদার আছে। নতুন করে পান্নার আবার ভালো লাগতে শুরু করল।

বড় সাহেব আসেন, যান। যখন থাকেন না তখন কখনো কখনো পান্না পুরনো বন্ধুদের কাছে যায়। গল্প করে। কিছু বলে, কিছু শোনে। আবার ফিরে আসে বড় কোঠি। বুড়ো চৌকিদার জিজ্ঞাসা করে, কি দিদি, কোথায় গিয়েছিলে?

পান্না হাসতে হাসতে বলে, হীরার বউয়ের একটা ছেলে হয়েছে যে!

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কবে ?

এখনও হপ্তা হয় নি। জান, বড় ভাইয়া, ছেলেটা খুব সুন্দর হয়েছে। ঠিক হীরার মতোই দেখতে হবে।

আচ্ছা ?

বড় ভাইয়া, তোমাকে কিন্তু আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

কি কাজ দিদি ?

তোমার ছেলেকে দিয়ে ধুলিগাঁও থেকে বাছাটার জন্য একজোড়া মল আনিয়ে দিতে হবে।

বুড়ো চৌকিদার হেসে বলে, আমি নিজেই এনে দেব।

তুমি আবার কষ্ট করে অত দূর যাবে।

ধুলিগাঁও আবার দূর কোথায়। আমরা কি মোটর চরা সাহেব ছু-এক মাইল হাঁটতে হলেই ভয় পাব ?

পান্না নিজের ঘর থেকে ছুটো দশ টাকার নোট এনে ওকে দিয়ে বলে, যদি কম পড়ে তুমি দিয়ে দিও। আমি তোমাকে…

না, না, কম পড়বে কেন ? ছোট্ট একজোড়া মল কিনতে কত আর পড়বে।

বড় সাহেব না থাকলে সময় যেন ফুরুতে চায় না পান্নার। রোজ ভাবে, একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমুবে কিন্তু এমনই স্বভাব হয়ে গেছে যে ঠিক সেই ভোরবেলায় ঘুম ভাঙবে। ঘুম ভাঙলে কিছুতেই বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না। জোর করে শুয়ে থাকলে বড্ড অস্বস্তি বোধ করে। উঠে পড়ে। একটু কাপড়চোপড় ঠিক করেই চোখে-মুখে জল দেয়। ঘরে একটা শ্রীকৃষ্ণের ছবি আছে কিন্তু পান্না কোনোদিন ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। ওর ভাল লাগে না। মথুরা কিছু বললেই ও বলতো, শ্রীকৃষ্ণজী আমাকে দেখেছেন যে আমি ওকে দেখব ?

ও কথা বলতে নেই বেটি ?

কেন বলবো না বাবুজী ? ছোটবেলায় মাকে নিয়ে নিলেন, কোন অন্যায় না করলেও স্বামীর ঘরে ঠাঁই পেলাম না। ভবিষ্যতে আরও কত কি সহ্য করতে হবে তা কে জানে ?

মথুরা কি বলবে ? চুপ করে থাকতো।

চোখে-মুখে জল দিয়েই, পান্না বারান্দার উপর থেকে চৌকিদারকে ডাকে, বড় ভাইয়া ?

কি দিদি ?

একটু দাঁড়াও, এক্ষুণি চা আনছি।

আগে আগে বুড়ো চৌকিদার বারণ করতো। কিন্তু এখন আর করে না। জানে ও চা না খেলে হয়তো পান্নাও খাবে না। মনে মনে কষ্ট পাবে, দুঃখ পাবে।

দু-গেলাস চা নিয়ে পান্না নীচে যায়। চা খেতে খেতে একটু-আধটু গল্প-গুজব, কথাবার্তা হয়।

আচ্ছা বড় ভাইয়া, রোজ রোজ রাত জাগতে তোমার খুব কষ্ট হয়, তাই না ?

বুড়ো চৌকিদার শুধু হাসে।

হাসছ কেন বড় ভাইয়া ? রোজ রোজ রাত জাগতে কি কারুর ভাল লাগে ?

বুড়ো চৌকিদার হাসতে হাসতেই বলে, অভ্যাস হয়ে গেছে দিদি। এখন আর কষ্ট হয় না।

তুমি স্বীকার না করলেই কি কষ্ট হয় না ? যত অভ্যাসই হোক রাত জাগাতে সবারই কষ্ট হবে।

রাতে ডিউটি দিই বলে মাইনেও তো বেশী পাই।

তা তো পাও কিন্তু···

না দিদি, গরীবের সংসারে ঐ টাকার অনেক দাম। ছুটো মেয়ের

সাদি দিয়ে তো আমি শেষ হয়ে গিয়েছি কিন্তু বড় সাহেবের এই নোকরি পাবার পর এখন অনেকটা সামলে নিয়েছি।

বড় ভাইয়া, মধুমতীর ছেলেটা কত বড় হলো?

সাত সাল।

এর মধ্যেই সাত সাল হয়ে গেল?

নাতীর কথা বলতে গিয়ে আনন্দে গর্বে ওর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, সাত সাল হলে কি হবে? হারামজাদা বড় বদমাশ হয়েছে।

পড়াশুনা করছে?

হাঁ হাঁ। দুসরা ক্লাসে পড়ছে।

আমি যখন দেখেছিলাম তখন কত ছোট্ট ছিল কিন্তু কি দারুণ দুরন্ত ছিল।

হারামজাদা ভীষণ দুরন্ত আছে কিন্তু পড়াই লিখাইতে খুব ভাল।

তাই নাকি?

হাঁ দিদি! ও হারামজাদা অনেক বড় হবে।

মধুমতীর কথা শুনলেই পান্নার মনে পুরনো দিনের স্মৃতির ঝড় ওঠে।

বুড়ো চৌকিদার—জগন্নাথ, মথুরার প্রায় সমবয়সী হলেও পান্না ছোটবেলা থেকেই ওকে বড় ভাইয়া বলে। মথুরা অনেকবার বলেও ওর ডাক পাল্টাতে পারে নি। ছোট ভাইবোনের চাইতে একজন বড় ভাই পাবার লোভ ওর বরাবরের। জগন্নাথ বলতো, ও যদি বড় ভাইয়া বলে ডেকে শান্তি পায় তো পাক। তারপর মথুরা আর কিছু বলতো না। জগন্নাথও ওকে দিদি ডাকতে শুরু করল। গ্রামের অনেক লোক হাসাহাসি করলে জগন্নাথ বলতো, একটা ছোট্ট মেয়ে যদি

আমাকে চাচা না বলে বড় ভাইয়া বলে তাহলে কি গঙ্গার পানি শুকিয়ে যাবে ?

জগন্নাথের মেয়ে মধুমতী আর পান্না সমবয়সী। মাত্র মাস ছয়েকের ছোটবড়। খুব ছোটবেলায় যখন পান্না ওর বাবা-মার সঙ্গে শঙ্করগড় এসে শঙ্করনাথের মেলায় গিয়েছিল, তখন থেকেই মধুমতীর সঙ্গে ওর ভাব। মেলায় জগন্নাথ ছোট্ট দোকান দিত। কাঁচের চুড়ি চুলের ফিতা, আলতা, সিঁদুর, খেলনা। আরো কত কী। মধুমতী জগন্নাথের পাশে বসে বসে অবাক দৃষ্টিতে মানুষের ভীড় দেখতো। পান্নাকে জগন্নাথের কাছে রেখে মথুরা স্ত্রীকে নিয়ে মেলা ঘুরতো। ওরা এসে দেখতো মধুমতী আর পান্না দোকানের খেলনা নিয়ে খেলছে, হাসছে।

সেই তখন থেকে ওদের বন্ধুত্ব। মথুরা যখনই পান্নাকে নিয়ে শঙ্করগড় এসেছে সব চাইতে আগে ছুটে এসেছে মধুমতী। এসেই ঝগড়া করতো মথুরার সঙ্গে, চাচা এতকাল পরে নিজের গ্রামের কথা মনে পড়ল ?

কি করব বেটি! রেল কোম্পানীর নোকরি ফেলে তো যখন তখন আসতে পারি না।

চাচা, এবার আর চট করে যেতে দিচ্ছি না। আর যদি সত্যি সত্যিই যেতে চাও পান্নাকে রেখে দেব।

যে কদিনই থাকুক পান্না আর মধুমতী সব সময় একসঙ্গে থাকতো। খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব, ঘুরে বেড়ান। কোন কোন দিন দু-জনেই একসঙ্গে রাতে শুতো। দুপুরের পর সূর্যের তেজ একটু কমলে ওরা আমগাছের দোলনায় দুলতে দুলতে কত কথা বলতো।

জানিস পান্না আমার সাদির কথা হচ্ছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

তোর সাদি করতে ইচ্ছে করে ?

হ্যাঁ। অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরতে পারব, সোনা-চাঁদির গহনা পাব।

সত্যি, সাদি হলে ভারী মজা। আমার সাদি কবে হবে রে মধুমতী ?

আমি চাচাকে জিজ্ঞাসা করব।

তখন ওদের কতই বা বয়স। বড় জোর নয়-দশ। কিন্তু শাড়ি পরে দু-জনেই। ঐ বয়সেই গ্রামের অনেক মেয়ের বিয়ে হয়েছে। হয়। ওরা অনেকের বিয়ে দেখেছে। তাইতো ওরাও বিয়ের কথা বলে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

খুব গভীর চিন্তান্বিতা হয়ে পান্না ওকে জিজ্ঞাসা করে, সাদির পরে তুই আমার সঙ্গে গল্প করবি ?

হ্যাঁ।

যদি তোর আদমী বারণ করে ?

না না, আমার আদমী অমন হবেই না।

এবার পান্না নিজের স্বামীর কথাই বলে, আমার আদমীও বারণ করবে না।

মধুমতী খুশীর হাসি হাসতে হাসতে বললো, আমাদের দু-জনের আদমীই খুব ভাল হবে।

তখন শঙ্করগড়ের মাটিতে অযোধ্যা সিমেন্ট কারখানার লম্বা চিমনি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় নি। জামগাছের ছায়ায় বসে বসে সারা দুপুর কাটিয়ে দেওয়াই ছিল ওদের মত মেয়েদের সব চাইতে বড় আনন্দ। তা ছাড়া মা তো ছিল না। পান্না একলা একলা বাড়িতে থাকতে পারতো না। ঐ জামগাছের আলো-ছায়ায় মধুমতীকে কাছে পাওয়াই ছিল ওর একমাত্র আনন্দ কিন্তু পরের বার যখন শঙ্করগড় গেল তখন মধুমতী নেই। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। পান্না একলা

বাড়ীতেই রইল ; ঐ জামগাছের আলো-ছায়ায় কিছুতেই যেতে পারল না।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পান্নারও বিয়ে হয়ে গেল। তার কিছুকাল পরে একটি জরির শাড়ি আর নতুন সোনার গহনা পরে স্বামীর সংসারে চলে গেল।

বছরখানেক পরে স্বামীর সঙ্গেই পান্না একবার হঠাৎ শঙ্করগড় এসেছিল। মথুরাও তখন ওখানে ছিল। জগন্নাথ মথুরার সঙ্গে গল্প করছিল। পান্নাকে দেখেই ছুটে গিয়ে মধুমতীকে খবর দিল। হাতের কাজ ফেলে মধুমতীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটল সহেলীর কাছে।

বেশীদিন নয়, মাত্র তিন-চারদিন দুই বন্ধু আবার একসঙ্গে সেই জামগাছের আলো-ছায়ায় বসে বসে অনেক, অনেক গল্প করেছিল।

মধুমতী জিজ্ঞাসা করল, তোর আদমী তোকে খুব প্যার করে, তাই না?

পান্না বললো, আগে তোর কথা বল।

না, না, তুই আগে বল।

পান্না মাথা নেড়ে বললো, তোর আগে সাদি হয়েছে তুই আগে বল।

তোর নতুন বিয়ে হয়েছে। আগে তোর কথা শুনি।

শেষ পর্যন্ত মধুমতীই আগে নিজেই কথা বললো, প্রথম দিন আমার কি ভয় লেগেছিল।

কেন?

বা রে! অত বড় একটা পুরুষমানুষ দরজা বন্ধ করে কোন কিছু না বলেই আমার পাশে শুতে এলে ভয় লাগবে না?

ঠিক বলেছিস। প্রথম দিন আমারও খুব ভয় করছিল।

কেন? কি করেছিল? প্যার করেছিল বুঝি?

পান্না হাসতে হাসতে বললো, আমার আদমী একটা ডাকাত। তা ছাড়া ভীষণ অসভ্য। ঐ এক নিশ্বাসেই ও মধুমতীকে প্রশ্ন করল, তোর আদমীও খুব অসভ্য ?

মিটমিট করে হাসতে হাসতে বললো, এক নম্বরের অসভ্য কিন্তু আমাকে খুব প্যার করে।

এ সব বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। সেদিনের স্বপ্ন আজ মধুমতীর বাস্তব আর পান্নার সব স্বপ্ন, সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। মধুমতীর স্বামী কাশীতে দপ্তরে কাজ করে, ছেলে সেজেগুজে বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে আর পান্না ?

বড়া সাব ? চা বানাব ?

চা ?

আপনি বলছিলেন শির দরদ করছে তাই……

হ্যাঁ। বড্ড মাথা ব্যথা করছে।

চা খেয়ে একটু শুয়ে পড়ুন! ভাল লাগবে।

আচ্ছা দাও এক কাপ চা।

একটু পরেই পান্না ট্রেতে করে চা নিয়ে যেতেই বড় সাহেব বললেন, আমি রাতে আর কিছু খাব না।

না, না, বড়া সাব। সারা রাত না খেয়ে থাকবেন না। তবিয়ত খারাপ…

চায়ের কাপে চুমুক দেবার আগেই বড় সাহেব ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, তবিয়ত ঠিকই থাকবে।

মাগার আপনার জন্য আজ চিকেন ··

চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই উনি বললেন, রোজ রোজ শুধু খাওয়া আর কাজ ভাল লাগে না।

অন্য দিন হলে চা দিয়েই পান্না চলে আসতো। আজ এলো

না। বড় সাহেবের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। রোজ রোজ এত কাম করলে তবিয়ত কি ঠিক থাকে? কাল আপনি আরাম করবেন। বিলকুল বেরুবেন না তবিয়ত ঠিক হয়ে যাবে।

বড় সাহেব একটু হাসলেন।

পান্না চলে গেল নিজের কাজে।

একটু পরেই শঙ্করগড়ের আকাশ থেকে সূর্যের শেষ আলোর চিহ্নটুকুও হারিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরীর হাজার হাজার আলো জ্বলে উঠল। পান্না রান্নাঘর, বারান্দা, ড্রইংরুমের আলো জ্বালিয়ে বড় সাহেবের শোবার ঘরের সুইচে হাত দিতেই উনি বললেন, আলো জ্বালিও না।

পান্না আবার নিজের কাজে চলে গেল। একটু পরেই রান্নাঘরে লাল আলো জ্বলতেই ও তাড়াতাড়ি বড় সাহেবের শোবার দরজায় দু-একবার টোকা মেরে ভিতরে গেল। বড় সাহেব চোখ বুজে শুয়ে আছেন। পান্না খুব আস্তে ডাকল, বড়ে সাব।

বড় সাহেব চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন, আমার ঘরের দুটো টেলিফোনই বাইরে নিয়ে যাও।

মাগার যদি কেউ ..

বলে দিও আমি ঘুমুচ্ছি। ডাকতে বারণ করেছেন।

পান্না আর কোন কথা না বলে দুটি টেলিফোনই বাইরে নিয়ে গেল। রান্নাঘরে ঢুকতেই ক্রীং ক্রীং। ও বেরিয়ে এসে টেলিফোন ধরল, হ্যালো!

আমি রায় সাহেব কথা বলছি।

নমস্তে সাব।

বিজয়বাবুকে দাও।

বড়ে সাব শুয়ে আছেন।

বল আমি কথা বলব।

মাগার উনি ডাকতে মানা করেছেন।

রায় সাহেব ঝপ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

পান্নাও টেলিফোন রেখে রান্নাঘরে বড় সাহেবের রাতের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে চলে গেল। বোধ হয় পাঁচ মিনিটও হয় নি আবার ক্রীং ক্রীং ক্রীং।

হ্যালো, আমি মুন্সীজী বলছি।

বড়ে সাব শুয়ে আছেন। ডাকতে মানা করেছেন।

কিন্তু উনি নিজেই আমাকে টেলিফোন করতে বলেছিলেন………।

বহুত জরুরী ব্যাপার।

বড়ে সাহেব নিজেই আমাকে বারণ করেছেন। আমি কি করব বলুন?

পাঁচ-দশ মিনিট পর পরই টেলিফোনের ঘণ্টা বাজে। কাজকর্ম করতে করতে বার বার এসে টেলিফোন ধরতে পান্না বিরক্ত হয়ে যায়। অন্য দিন আটটার মধ্যেই বড় সাহেবের খাবার তৈরী হয়ে যায় কিন্তু আজ প্রায় নটা বেজে গেল।

বড়ে সাব!

বড় সাহেব চোখ বুজে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। কোন জবাব দিলেন না।

পান্না আবার ডাকল, বড়ে সাব!

এই ভাবে শুয়ে শুয়েই বড় সাহেব খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, কে?

জী, আমি পান্না। খানা আনব বড়ে সাব?

না।

মাগার…

একটুও খেতে ইচ্ছে করছে না।

একটা ফুল্কো আর একটু চিকেন…

না, না, চিকেন-টিকেন খেতে ইচ্ছা করছে না।

তাহলে একটু স্থপ আনি।

স্থপ ?

হাঁ বড়ে সাব!

আচ্ছা দাও।

পান্না তাড়াতাড়ি স্থপ আনল। বড় সাহেব আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসতেই ও জিজ্ঞাসা করল, এখনও শির দরদ করছে ?

একটু কমেছে।

স্থপ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন কাল স্থবা তবিয়ত ঠিক হয়ে যাবে।

বড় সাহেব স্থপ খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ টেলিফোন করেছিলেন ?

অনেকে।

আমি শুয়ে আছি শুনে কেউ কিছু বললেন ?

না।

বড় সাহেব একটু হেসে বললেন, আমি শুয়ে আছি জেনেও কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না আমার শরীর খারাপ কিনা ?

নেই বড়ে সাব ?

চমৎকার! অথচ এরাই এমন ভাব দেখায় যেন আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে।

পান্না শুধু শোনে। কিছু বলে না।

স্থপ খাওয়া শেষ হলে বড় সাহেব যেন নিজের মনে মনেই বললেন, সারা জীবন কি শুধু বেইমানদের নিয়েই আমাকে কাটাতে হবে!

পান্না চলে এল।

সমস্ত কাজকর্ম, নিজের খাওয়া-দাওয়া, ঘরদোরের দরজা-জানলা বন্ধ করতে বেশ রাত হলো। পান্নার ঘাড় নেই কিন্তু নাইট শিফট-এর সাইরেন বাজলেই বুঝতে পারে দশটা বাজল। রান্নাঘরের জানলা

দিয়ে দূরের বড় রাস্তায় সামান্য কয়েকজনকে দেখেই বুঝল সাড়ে দশটা বেজে গেছে। প্রতিদিনের মত বড় সাহেবের ঘরে খাবার জলের ফ্লাস্ক রাখতে গিয়েই পান্না একটু ঘাবড়ে গেল। বড় সাহেব আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়েও যেন শীতে কাঁপছেন। দু-এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর পান্না পাশের ঘরের আলমারী থেকে কম্বল এনে খুব সাবধানে বড় সাহেবের গায়ের উপর দিতেই উনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, কে ?

আমি পান্না।

পান্না ?

জী।

বড্ড শীত করছে পান্না।

আউর একটা কম্বল দেব বড়ে সাব ?

দাও।

সঙ্গে সঙ্গে পান্না আরো একটা কম্বল এনে দেবার পর জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার সাবকে খবর দেব ?

না, না, কোন দরকার নেই।

কলকাত্তা থেকে টেলিফোন এলে কি······

বড় সাহেব যেন একটু রেগেই বললেন, কলকাতায় খবর দিয়ে কি হবে ?

কি আর করবে ? পান্না ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে এল। শুয়ে পড়ল কিন্তু কিছুতেই ঘুম এলো না। বড় সাহেবের কথাই ভাবছিল। শরীর খারাপ, জ্বর হয়েছে। তবু কাউকে খবর দিতে দিলেন না। ডাক্তারবাবুকেও না, কলকাতাতেও না। কিন্তু কেন ? ডাক্তারবাবু তো ওরই কর্মচারী। খবর দিলেই ছুটে আসতেন অথচ ডাক্তারবাবুর কথা বলতেই বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, না, না, দরকার নেই। কলকাতাতেই তো ওর বাবা-মা ভাইবোন স্ত্রী-পুত্র

সবাই। সেই কলকাতায় খবর দেবার কথা বলতেও বললেন, ওখানে খবর দিয়ে কি হবে? আশ্চর্য! পান্না ভেবে কোন যুক্তি পায় না।

রাত এখন কটা? বোধহয় দেড়টা-দুটো বেজে গেছে। তবু পান্নার চোখের পাতা ভারী হয় না। বড় সাহেবের কথাই ভাবে। না ভেবে পারে না। ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে অনেক কথা. অনেক প্রশ্ন ভীড় করে। বড় সাহেব কি ডাক্তারবাবুকে পছন্দ করেন না? কলকাতার বাড়ীর কাউকেই কি উনি ভালবাসেন না? নাকি বাড়ীর কেউই ওকে ভালবাসেন না?

রাত আরো গভীর হয়। পান্না তখনও ভাবে। ভাবতে ভাবতে কোন কুলকিনারা পায় না। বড় সাহেবের টাকার অভাব নেই, অভাব নেই লোকজন-আত্মীয়স্বজনের; কিন্তু তবু রোগশয্যার পাশে কেউ নেই। উনি একলা, নিঃসঙ্গ। পান্না মনে সমবেদনা বোধ না করে পারে না।

হঠাৎ কার কথা শুনে ও চমকে উঠল। এত রাতে কেউ এল নাকি? নীচে থেকে বুড়ো চৌকিদার—বড়ে ভাইয়া কিছু বলছে নাকি?

দু-এক মিনিট কান খাড়া করে রইল। হ্যাঁ, আবার সেইরকম কথা! বড় সাহেব কিছু বলছেন নাকি? পান্না তাড়াতাড়ি উঠে ওর ঘরের দিকে গেল।

বারন্দা পার হয়ে ড্রইংরুমে পা দিতেই পান্না আরো স্পষ্ট শুনতে পেল বড় সাহেবের গলা। বুঝতে পারল ওর জ্বর বেড়েছে, বোধহয় আরো বেশী যন্ত্রণা বোধ করছেন সারা শরীরে। বড় সাহেবের

শোবার ঘরের দরজার বাইরে থেকেই পান্না আস্তে আস্তে ডাকল, বড়ে সাব !

কোন জবাব নেই।

আবার ডাকল, বড়ে সাব ! বড়ে সাব !

জবাব এলো না কিন্তু কাতরানি শুনতে পেল।

পান্না দরজা খুলে একটু উঁকি দিতেই দেখল, বড় সাহেব ছটফট করছেন। নাইটল্যাম্পের সুইচ টিপে দিতেই দেখল, কম্বল মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে অস্পষ্টভাবে কি যেন বলছেন। পান্না একটু এগিয়ে গেল। ডাকল, বড়ে সাব !

না, কোন জবাব নেই। উনি আপন মনেই কি যেন বকবক করে চলেছেন।

আরো একটু কাছে এগিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে ডাকল, বড়ে সাব ! শরীর খারাপ লাগছে ?

কে ?

আমি পান্না।

একটু জল দাও তো। বড্ড পিপাসা লেগেছে।

পাশের ফ্লাস্ক থেকে গেলাসে জল ঢেলে এগিয়ে ধরল।

বড় সাহেব হাত বাড়িয়ে গেলাস ধরলেন না উঠেও বসলেন না। শুয়ে শুয়েই হাঁ করলেন। পান্না একটু একটু করে ওর মুখে জল ঢেলে দিল। শেষবারে মুখ থেকে একটু জল গড়িয়ে পড়তেই পান্না তাড়াতাড়ি মুছিয়ে না দিয়ে পারল না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠল।

এর আগে কোনদিন বড় সাহেবকে ছোঁয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবে নি। আজ এই গভীর রাত্রে অসুস্থ বড় সাহেবকে হঠাৎ ছুঁয়েও পান্না মনে মনে অনুতপ্ত না হয়ে পারল না। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সেই অনুতপ্ত

মন বিস্মিত হয়ে গেল। বড় সাহেবের শরীর যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ও দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণের জন্য কিছুই ওর মাথায় এল না। তারপর একবার ভাবল ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারে টেলিফোন করবে। না, থাক। যদি বড় সাহেব সত্যি সত্যিই রেগে যান? হয়তো ডাক্তারবাবু ও পান্না—দু-জনেরই চাকরি যাবে। দরকার নেই ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে। আরো কত কি ভাবল। শেষ পর্যন্ত জল আর ন্যাকড়া এনে মেঝেয় বসে বসে বড় সাহেবের কপালে জলপটি দিতে শুরু করল। গায়ে এতই জ্বর যে মিনিটে মিনিটে জলপটির ভেজা ন্যাকড়া শুকিয়ে যাচ্ছিল। পান্না সঙ্গে সঙ্গে আবার ভিজিয়ে দিতে লাগল।

ঘরে একটা ছোট্ট মিটমিটে আলো জ্বলছে। বড় সাহেব জ্বরে বেহুঁস। পান্না মেঝেয় বসে ওর কপালে জলপটি দিতে দিতে এক মনে ওকেই দেখছে। এমনভাবে তো ও কোনদিন বড় সাহেবকে কাছেও পায় নি, দেখেও নি। তাইতো বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গিয়েছিল। বড় সাহেব একবার চোখ মেলে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে? কে তুমি?

বড়ে সাব, আমি পান্না!

বড্ড মাথা ব্যথা করছে। একটু মাথা টিপে দেবে?

জরুর।

সঙ্গে সঙ্গে পান্না বড় সাহেবের মাথা টিপে দিতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ পরে মনে হলো, জ্বর কমে আসছে। আরো কিছুক্ষণ পরে একটু একটু ঘাম হতে শুরু করল। পান্না মনে মনে একটু স্বস্তি পেল।

একটু এপাশ-ওপাশ করার পর বড় সাহেব বললেন, বড্ড গরম লাগছে। কম্বলগুলো সরিয়ে দাও তো।

বড়ে সাব, একটু পরে।

বড্ড গরম লাগছে যে।

বুখার ছেড়ে যাচ্ছে কিনা, তাই……

একবার কম্বলগুলো উঠিয়ে নাও তো। আমি বাথরুম যাব।

পান্না কম্বল আর চাদর তুলে নিতেই বড় সাহেব বেশ কষ্ট করেই উঠে বসলেন, কিন্তু দাঁড়াতে গিয়েই আবার বসে পড়লেন। একটা হাত এগিয়ে দিয়ে বললেন, পান্না, একটু ধরবে? মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল।

দুহাত দিয়ে বড় সাহেবকে ধরে ও বললো, এখনও বেশ বুখার আছে। মাথা তো ঘুরবেই।

বড় সাহেবকে বাথরুমের ভিতরে দিয়ে পান্না বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরেই দরজার ওপাশ থেকে বড় সাহেবের গলা শোনা গেল, পান্না একটু ধর তো!

পান্না দরজা খুলে এক পা এগিয়ে বড় সাহেবের একটা হাত ধরতেই উনি আরেকটা হাত ওর কাঁধে রাখলেন। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পান্না ওকে ধরে ধরে বিছানায় শুইয়ে গায়ে চাদর-কম্বল দেবার পরই বড় সাহেব বললেন, একটু মাথা টিপে দেবে?

জরুর বড়ে সাব।

মেঝেয় বসে বসে পান্না বড় সাহেবের মাথা টিপে দিচ্ছিল। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ পরে বড় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কটা বাজে বলতে পার?

পান্না উঠে গিয়ে টেবিল লাইটের আলো জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখে বললো, সাড়ে তিন।

সাড়ে তিনটে?

জী।

তুমি ঘুমুবে না ?

এক রাত ঘুম না হলে আমার কিছু হবে না।

কিছু হবে না বললেই কি হয় ? তুমি যাও শুয়ে পড়।

বড়ে সাব, আপনি ঘুমিয়ে পড়লেই আমি চলে যাব।

কাল সারা দিন রোদ্দুরের মধ্যে ঘুরাঘুরি করেছি বলেই হঠাৎ এ রকম জ্বর হলো। তোমার কোন চিন্তা নেই।

কাল সারা দিন আপনি বাড়ীর বাইরে যেতে পারবেন না।

বড় সাহেব একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

নেই বড়ে সাব, তাহলে আবার তবিয়ত খারাপ হবে।

সারাদিন বাড়ীর মধ্যে থেকে কি করব ?

কাল সারা দিন আপনি আরাম করবেন।

সারা দিন আরাম করব ?

জী বড়ে সাব।

বড় সাহেব আর কথা বললেন না। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

কদিন পরে শঙ্করগড় থেকে চলে যাবার আগে বড় সাহেব পান্নাকে ডাকলেন। পান্না যেতেই একটা একশ টাকার নোট এগিয়ে ধরে বললেন, এটা তুমি নাও।

কেন বড়ে সাব ?

তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করলে তাই ..

পান্না মুখ নিচু করে বললো, মাফ করবেন বড়ে সাব। আপনার সেবা করতে পেরেছি তাই যথেষ্ট। আমার কিছু চাই না।

বড় সাহেব দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে পারলেন না। মিনিটখানেক পান্নার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তিন

দিনে দিনে শঙ্করগড় আরো কত বদলে গেল। ছেলেদের স্কুল হলো, মেয়েদের স্কুল হলো, লাইব্রেরী হলো। সকালবেলায় ছেলেমেয়েরা বই খাতা নিয়ে দল বেঁধে স্কুলে যায়, বিকেলে ফিরে আসে। রোজ বিকেলবেলায়, সন্ধ্যার পর কারখানার লোকজনে লাইব্রেরী ঘর ভরে যায়। সপ্তাহে একদিন পুরুষদের জন্য লাইব্রেরীর দরজা বন্ধ, খোলা থাকে শুধু মেয়েদের জন্য।

শঙ্করগড়ের বিপ্লব-ইনকিলাব-ক্রান্তি এখানেই থামল না। আরও এগিয়ে গেল। লাইমস্টোন ডিপোর পাশের খোলা মাঠ কংক্রীটের থাম আর তার দিয়ে ঘেরা হলো। শুরু হল ফুটবল খেলা। এখন রোজ বিকেলবেলায় এই ডিপোর মাঠে কয়েকশ মানুষ। তারা ফুটবল খেলা দেখতে দেখতে চিৎকার করে, হাততালি দেয়, কখনো কখনো ঝগড়াঝাঁটিও করে নিজেদের মধ্যে। তারপর বর্মনবাবু গিয়ে মিটমাট করে দেন।

ফুটবল খেলার শীল্ড-কাপ-মেডেল দেবার দিন শুধু শঙ্করগড় নয়, আশে-পাশের সব গ্রামের মানুষ জড় হয় এই ডিপোর মাঠে। কম্পিটিশনের খেলা আগেই শেষ। সেদিন খেলা হয় ওয়ার্কার্স আর অফিসারদের মধ্যে। ওয়ার্কার্সরা বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে মাঠে আসে অনেক আগেই। তারপর অফিসারদের বৌ-ছেলেমেয়েরাও সেজেগুজে এসে চেয়ারে বসেন। শঙ্করনাথের মেলার মত মাঠের চারপাশে দোকানীদের ভীড় হয়। পান-বিড়ি-সিগারেট ছাড়াও কত রকমের

খাবার দোকান বসে। চারটে বাজার দশ-পনের মিনিট আগেই দু-দলের খেলোয়াড়রা মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনা বেড়ে যায়। এই বিশেষ খেলায় বহুজনের অনুরোধে কর্মীদলের অধিনায়কত্ব করেন স্বয়ং বড় সাহেব। উনি ছাড়া বাকী দশজনই কারখানার কর্মী। অফিসারদের অধিনায়ক হন জেনারেল ম্যানেজার রায় সাহেব। এই বিশেষ প্রদর্শনী খেলায় অফিসাররাই হেরে যান। কর্মীদলের পক্ষ থেকে অধিনায়ক বড় সাহেব যখন মিসেস রায়ের হাত থেকে পুরস্কার নেন তখন আনন্দে কর্মীরা ফেটে পড়েন। এরপর ফটো তোলা ও খাওয়া-দাওয়া আছে।

শঙ্করগড়—অযোধ্যা সিমেন্ট কোম্পানীর এই সব বিবর্তনের পিছনে ছোট্ট একটি কাহিনী আছে। বাইরের কেউ তা জানেন না।

বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। বড় সাহেব খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শোবার ঘরে যাবার একটু পরেই পান্নাকে ডাকলেন।

বড়ে সাব, আপনি ডেকেছেন?

এক্ষুণি একবার বর্মনকে আসতে বল তো। আলো জ্বালতে গিয়ে হাতে শক্ লাগল।

বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই পান্না পাওয়ার-হাউসে টেলিফোন করল, বর্মনবাবু কি কোয়ার্টারে?

কোয়ার্টারে।

লাইনটা ওর কোয়ার্টারে দিন।

কোয়ার্টারে লাইন দিতেই পান্না ওকে বললে, বড় সাহেব এক্ষুণি আপনাকে ডাকছেন।

কেন ?

আলো জ্বালতে গিয়ে বড় সাহেব ভীষণ শক খেয়েছেন।

আচ্ছা আসছি।

পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই সাইকেলে চেপে বর্মনবাবু বড় কোঠির গেটে হাজির হলেন। বড় সাহেবের অনুমতি ছাড়া এত রাত্রে কেউ কোঠিতে ঢুকতে পারেন না। চৌকিদার পান্নাকে ডেকে বর্মনবাবুর আসার খবর দিতেই ও বললো উপরে পাঠিয়ে দাও। বর্মনবাবু উপরে এসে বড় সাহেবের বেডরুমে চলে গেলেন।

স্যার ডেকেছেন।

হ্যাঁ, বসো। তুমি বোধ হয় জান কিছু কিছু আজেবাজে এলিমেন্টস্ ইতিমধ্যেই যাতায়াত শুরু করেছে।

বর্মনবাবু এসে বললেন জানি স্যার। তবে ওরা কিছু সুবিধে করতে পারছে না।

সে যাই হোক বাইরের কেউ কিছু করার আগেই তুমি কিছু কর।

সেদিন ঐ মাঝরাতেই পরিকল্পনা ঠিক হয়ে গেল।

ছাখ বর্মন, কালই এক মিটিং ডাকবে। মিটিং-এ সবার আগে তুমি বলবে, কারখানা চলছে, চলবে। আরো ভাল করে চলবে কিন্তু আমাদের সুখ-সুবিধার দিকে বড় সাহেবকে আরো একটু নজর দিতে হবে।....

বুঝেছি স্যার।

এর পর আমি বক্তৃতা দেব। সব শেষে বলব, মাঠে-ঘাটে মিটিং করে সব সময় সব কিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়। আপনারা ইউনিয়ন গড়ে তুলুন। বর্মনবাবুর মত কোন জনপ্রিয় লোককে সভাপতি করুন।...

আপনি ঐটুকু বললেই যথেষ্ট।

ইউনিয়ন করার মাসখানেকের মধ্যে ঐ হতচ্ছাড়া নটবর মিশ্রকে কারখানা থেকে সরাতে হবে।

শুধু তাকে না স্যার, আরো তিন-চারজনকে···

না, না, একসঙ্গে ওদের সবাইকে সরালে সবাই সন্দেহ করবে। নটবরকে সরালেই ওরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ঠিক আছে স্যার। একটু বেশী ধেনো খাইয়ে মালগাড়ির সান্টিং লাইনে রেখে দিলেই···

না, না, ও সব করো না। মাস ছয়েক ধরে ধেনো খাবার ব্যবস্থা করে দেবার পর একটা খচ্চর মেয়ে জুটিয়ে দিলেই নটবর সব ভুলে যাবে।

ওসব ঝামেলায় অনেক খরচা পড়বে স্যার।

ছ' মাসের ধেনোর দাম আর একটা মেয়ে ত? কত আর খরচা পড়বে? বড় জোড় দু' তিন হাজার?

হাজার দুই হলেই যথেষ্ট।

তোমারও ত কিছু চাই।

বর্মন একটু হাসে।

না, না, হাসির কথা নয়। এই মিটিং-ঠিটিং বা ইউনিয়ন করার জন্য আমি তোমাকে আজই পাঁচ হাজার দিচ্ছি। দরকার হলে আরও দেব।

বোধ হয় দরকার হবে না স্যার।

যদি দরকার হয় তাহলে বলতে ভয় পেয় না। আর শোন···

বলুন স্যার।

তুমি যতদিন ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট থাকবে ততদিন তুমি আমার কাছ থেকে মাসে মাসে হাজার টাকা পাবে।

বড় সাহেব আর কিছু না বলে আলমারী থেকে একটা মোটা নোটের বাণ্ডিল বের করে বর্মনকে দিয়ে বললেন, যাও। আর দেরী করো না।

পরের দিনই বড় সাহেব কারখানায় এলেন। শ্রমিক কর্মী, অফিসারদের নিয়ে সারা দিন মিটিং করার পর বড় অফিসের সামনের মাঠে সবার সামনে ঘোষণা করলেন, এ কারখানা আমার ও আপনাদের। আমি অর্থ দিয়েছি, আপনারা দিচ্ছেন পরিশ্রম। এ কারখানার উন্নতি ও কল্যাণে আমাদের সবারই স্বার্থ আছে।

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি।

বড় সাহেব আবার শুরু করলেন, আপনারা বিশ্বাস করুন, এই কারখানার পাকা বনিয়াদি তৈরী করার কাজে আমি জেনারেল ম্যানেজার সাহেব ও অন্যান্য অফিসাররা এতকাল এত ব্যস্ত ছিলাম যে আপনাদের সুখ-সুবিধার দিকে আমরা নজর দিতে পারি নি। কারখানার বনিয়াদই যদি পাকা না হয় তাহলে আপনাদের সুবিধা দেব কেমন করে?

সম্মতিতে সবাই মাথা নাড়লেন।

কারখানার আরো অনেক কথা বলার পর বড় সাহেব জানালেন, ক্যান্টিন জেনারেল ম্যানেজার বা অন্যান্য অফিসারদের জন্য নয়— ক্যান্টিন আপনাদের, আপনারাই এর পরিচালনা করবেন।

হাততালি।

ক্যান্টিনের কর্মচারীরাও কারখানারই কর্মচারী। তাদের মাইনে-বোনাস আমরাই দেব কিন্তু বর্মনবাবুর সভাপতিত্বে যে ক্যান্টিন কমিটি হবে তাতে শুধু আপনারাই থাকবেন। কারখানার তরফ থেকে একমাত্র ওয়েলফেয়ার অফিসারই সে কমিটির সদস্য হবেন।

বর্মনবাবু চিৎকার করে উঠলেন বড় সাহেব ?

সবাই বললেন, জিন্দাবাদ !

বড় সাহেব !

জিন্দাবাদ।

বড় সাহেব !

জিন্দাবাদ !

এর পর যখন বড় সাহেব ঘোষণা করলেন, তিন মাসের মধ্যেই আমরা ছেলেমেয়েদের স্কুল. লাইব্রেরী ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করব তখন আনন্দে শ্রমিক-কর্মীরা উন্মাদ হয়ে উঠল। সর্বশেষে উনি শুধু বললেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমরা সবাই আপনাদের জন্য যথাসাধ্য করব কিন্তু আশা করব আপনারাও কারখানার জন্য যথাসাধ্য করবেন। আর মনে রাখবেন, জেনারেল ম্যানেজার সাহেবই আপনার নিত্যকার বন্ধু ও অভিভাবক।

বড় সাহেব তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। বর্মনবাবুও তাঁর কথা রেখেছিলেন। ইউনিয়ন হলো এবং উনিই তার সভাপতি হলেন। ক্যান্টিনে খাবার-দাবারের দাম কমল। শুরু হলো সমবায় বিপণি। চাল-ডাল, তেল-নুন, আটা-গম, সাবান-তেল, মশলা, স্কুলের বইখাতা, মিলের কাপড়, তাঁতের শাড়ি, কেরোসিন লণ্ঠন-টর্চলাইট। এক কথায় যে যা চায় তাই পায়। তাও আবার ঠিক···দামে। একটা ফুটো পয়সার এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। ফুটো পয়সার জিনিস কিনলেও রসিদ দেয়। কারখানার শ্রমিক-কর্মীদের কাছে বর্মনবাবু এখন সাক্ষাৎ ভগবান। সবার মুখেই ওর প্রশংসা সত্যি একটা মরদকা বাচ্চা।

একদিন ক্যান্টিন কমিটির মিটিং শেষ হবার পরই সবার সামনে বর্মনবাবু রামপেয়ারীকে বললেন, রোজ রোজ ক্যান্টিনে খেয়ে তো শরীর গেল। তুমি আমাকে ডাল-ভাত রেঁধে দিতে পার ?

রামপেয়ারী কিছু বলার আগেই ক্যান্টিন কমিটির তিন-চারজন সদস্য প্রায় একসঙ্গেই বললেন, ক্যান্টিনে কাজ করা আর আপনার রান্না করে দেওয়া তো একই ব্যাপার। এবার রামপেয়ারীর দিকে তাকিয়ে ওরা বললেন, কাল থেকেই তুমি প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে রান্না করবে।

বর্মনবাবু ন্যাকামি করে ক্যান্টিন ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার রান্না করবার জন্য ওর কান্টিনের কাজের ক্ষতি না হয়।

ম্যানেজার বললেন, না স্যার আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

বর্মনবাবু বললেন, তবে আমার ওখানে তো খুব বেশী সময় লাগবে না। দুপুরের দিকে ঘণ্টা দুই, আর বিকেলের দিকে বড় জোর ঘণ্টাখানেক।

প্রথম প্রথম বর্মনবাবুর বাড়ীতে রান্নাবান্না করেও কিছু সময়ের জন্য ক্যান্টিনে যেত। টুকটাক কাজকর্মও করতো। তারপর আস্তে আস্তে ক্যান্টিনে যাওয়া কমতে শুরু করল। বর্মনবাবুর বাড়ীর কাজ করে রামপেয়ারী ঘুরে বেড়ায়, গল্প করে বন্ধুদের সঙ্গে। কখনও চলে যায় গিরিজার চায়ের দোকানে।

শুকদেব হাসতে হাসতে বলে, কিরে রামপেয়ারী এতদিন পরে আমাকে মনে পড়ল ?

টিনের কৌটো থেকে একটা বিস্কুট নিয়ে রামপেয়ারী বেঞ্চিতে বসতে গিয়ে বললো, তোর কথা ভেবে ভেবে আমি কত রোগা হয়ে গেছি, দেখতে পাচ্ছিস না।

ওর কথায় গিরিজা, কিষাণ ও আরো দু-তিনজন হেসে উঠল।

শুকদেব হঠাৎ বলে, তুই চব্বিশ ঘণ্টাইতো বর্মনবাবুর সেবায় ব্যস্ত। কখন তোর খোঁজ নেব বল ?

কথাটা শুনে সবাই মিটমিট করে হাসলেও রামপেয়ারী তা

খেয়াল না করেই বললো, ঠিক আছে। আমি এখনই বর্মনবাবুকে বলছি যে শুকদেব বলছিল......

ঐটুকু শুনেই শুকদেবের বুক কেঁপে উঠল, মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। শুকনো গলায় কোনমতে বললো, তোকে আমি কত প্যার করি, তুই-ই আমার সর্বনাশ করবি ?

এক টুকরো বিস্কুট মুখে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, তুই পাগল হয়েছিস ? তোর সর্বনাশ আমি করব ? আমি বর্মনবাবুকে শুধু বলব শুকদেব আমাকে....

শুকদেব যেন আর শুনতে চায় না। ওর কথাটা শেষ না হতেই জিজ্ঞাসা করল, চা খাবি ?

দিতে বল।

আরো একটা বিস্কুট খাবি ?

আর কিছু দিবি না ? শুধু বিস্কুট ?

এতক্ষণে শুকদেবের হৃতপিণ্ডটা আবার ওঠা-নামা শুরু করে। একটু হাসে। বলে তোকে আরো কত কি দেব কিন্তু কিষাণ আছে বলে......

ঠিক আছে, পরে লুকিয়ে দিস কিন্তু ভুলে যাস না যেন।

ভগবান কী কসম ! তোর কথা আমি ভুলব ?

এবার কিষাণ উল্টোদিকের বেঞ্চি থেকে উঠে রামপেয়ারীর পাশে বসল।

রামপেয়ারী চা-বিস্কুট খেতে খেতে খেতে বললো, কিরে, আর বুঝি দূরে বসে থাকতে পারলি না ?

বাঘ যেখানে থাকে শেয়ালও তার কাছাকাছি থাকে, তা তুই জানিস না ?

আমি বাঘ ?

তবে কি আমি ?

তুই আমার প্রথম সর্বনাশ করেও বলছিস আমি বাঘ?

ও সব পুরনো কথা ছেড়ে দে। এখন তো তুই বাঘ। আমরা সবাই তোকে ডর করি।

কেন রে?

কোনদিন দেখব তুই বড় সাহেবের শোবার ঘরেও....

রামপেয়ারী সঙ্গে সঙ্গে ওর গালে একটা চড় মেরে বললো, সারা ছুনিয়াটাই তোর মত হারামী, তাই না রে? যার দয়ায় বেঁচে আছিস তার নামে...

রামপেয়ারীকে কথাটা শেষ করতে হলো না। শুকদেব আর গিরিজা প্রায় একসঙ্গেই বলল, কিষাণ, তুই শালা এক নম্বরের হারামী হয়ে গেছিস।

রামপেয়ারী আর বসে না। হেলে-ছুলে হাঁটতে হাঁটতে বর্মনবাবুর কোয়ার্টারের দিকে চলে যায়।

বর্মনবাবু এখন অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। নিজের কাজকর্ম ছাড়াও হাজার কাজ। ক্যান্টিন আর সমবায় বিপণির জন্যই প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা সময় চলে যায়। কোয়ার্টারে থাকলেও মিনিটে-মিনিটে লোক আসে। রাত আটটা-সাড়ে আটটা বা নটা পর্যন্ত লোকজন থাকলে বর্মনবাবু হঠাৎ ডাকেন, রামপেয়ারী।

মাথায় ঘোমটা টানতে টানতে রামপেয়ারী দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে, জী বাবুজী!

রাত হয়ে যাচ্ছে। তুমি আমার খাবার ঢেকে রেখে কোয়ার্টারে চলে যাও।

পরশু ভী তো খানা ঢেকে গিয়েছিলাম কিন্তু....

বর্মনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, পরশু সব লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে এত রাত হয়ে গেল যে...

উপস্থিত সাকরেদরা সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমরা বসছি। আপনি খানা খেয়ে নিন।

খাবার আগে আমি স্নান করি। তা ছাড়া একবার পেটে ভাত পড়লেই আমি ঘুমে ঢুলতে শুরু করব।

রামপেয়ারী বললো, বাবুজী আমি আস্তে আস্তে খানা গরম করছি। আপনি কথাবার্তা বলে স্নান করতে যান।

না, না, এক্ষুণি খাবার গরম করো না।

এ সব শোনার পর সাকরেদরা উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমরা আজ চলি। আপনি খাওয়া-দাওয়া…

তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

বর্মনবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও ওরা চলে যায়। রামপেয়ারীও চলে যায় আরো দেড়-দু ঘণ্টা পরে! বর্মনবাবুকে খাইয়ে-দাইয়ে একটু আদর যত্ন করে যেতে যেতে একটু দেরী তো হবেই।

প্রকাশ্যে না হলেও চুপিচুপি সবাই রামপেয়ারীকে নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু শুকদেবের বউও কম নয়। স্বামী নেশা করে টাকাকড়ি উড়িয়ে দেয়, সংসার চলে না। তাই ও দু-এক বাবুর বাড়ীতে কাজ করার পর স্টোরবাবুর বাড়ী কাজ নিল। কিছুদিন পরেই স্টোরবাবুর বউয়ের বাচ্চা হবে বলে কলকাতা চলে যাবার পরই শুকদেবের বউ রান্নাঘর ছাড়াও শোবার ঘরে যাতায়াত শুরু করল।

প্রায় বছরখানেক পরের কথা। হঠাৎ একদিন ধোপা ঘোষবাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, মাইজী স্টোর বাবুর বিবি আসবেন না?

স্টোরবাবুর বিবির খবরে তোর কি দরকার? ঘোষবাবুর বর্ষীয়সী গিন্নী একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার কোন দরকার নেই মাইজী। কিন্তু উনি তাড়াতাড়ি এলেই ভাল।

কেন?

অনেক ইতস্তত করে ও বললো, শুকদেবের বউ মেয়েটা ভাল না।

তার মানে ?

মাইজী, আমি বুড়ো হয়েছি। ভাল মন্দ বুঝি। তাই না বলে পারছি না...

ঘোষবাবুর গিন্নী আর ধৈর্য ধরতে পারেন না। তিনি বললেন, এত ভনিতা না করে আসল কথাটা বল।

ও তখন সোজাসুজি বলে দেয়, স্টোরবাবুর বিবি প্রায় এক বছর নেই। কিন্তু বিছানার চাদরে, বালিসের তোয়ালেতে সব সময় সিঁদুর—

সে কি ?

ভগবান কী কসম ! আমি মিথ্যে কথা বলছি না। আপনি বিশ্বাস না করলে এক্ষুণি কাপড়ের বাণ্ডিল খুলে দেখিয়ে দিতে পারি।

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ঘোষবাবুর গিন্নী একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, তুই যা। কিন্তু আমাকে বলেছিস তা আর কাউকে বলিস না।

না, না, কাউকে বলব না।

পরের দিন ঘোষবাবু স্টোরবাবুকে অফিসে ডেকে বললেন, দ্যাখ সুকুমার, তোমাকে একটা কথা অনেক দিন ধরেই বলব বলব ভাবছি কিন্তু এখন না বলে পারছি না।

ঘোষবাবু অফিসের বড়বাবু। তার ঐ কথা শুনেই সুকুমার দত্তের মুখ শুকিয়ে গেল। শ্বশুরের দৌলতে চাকরি পেয়ে তারই মেয়েকে বিয়ে করেন। এই ঘোষবাবুর কৃপায় সুকুমার দেড়শ টাকা বেশী মাইনেতে এখানে স্টোরবাবু হয়ে এসেছে। এখন সেই ঘোষবাবুই যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে তো...

গম্ভীর হয়ে ঘোষবাবু বললেন, তুমি যে সব সাপ্লাইয়ারের কাছ

থেকেই বেশ টু-পাইস নিতে শুরু করেছ তা বড় সাহেবের কানে পৌঁছেছে। তোমার জন্য সাপ্লায়াররা হয় খারাপ মাল দিচ্ছে নয়ত কম মাল দিচ্ছে, তা তো তুমি ভাল করেই জান।

সুকুমার দত্ত চুপ।

ঘোষবাবু এর পরেও থামলেন না। বললেন, এখানে ফাঁকি দিয়ে, চুরি করে বেশীদিন চাকরি রাখা যায় না। তা ছাড়া বৌমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে তুমি কি লাগিয়েছ বলতো? ছি ছি!

ঘোষবাবুর ঐ এক ডোজেই সুকুমার দত্ত সিধা হয়ে গেল। কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়।

চার

পাকা মোকান আর বিজলী বাতি শঙ্করগড়ের মানুষগুলিকে সত্যি বড় লোভী করে তুলল। বড় সাহেব না থাকলে বুড়ো চৌকিদার পান্নাকে বলে, দিদি, মথুরা ঠিকই বলতো, কারখানার চিমনিটার মতো শঙ্করগড়ের মানুষগুলোও কালো হয়ে যাচ্ছে।

আবার কি হলো ?

বুড়ো জগন্নাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, দিদি, তুমি মথুরার মেয়ে। আমার মধুমতীর সহেলী। তোমাকে কি সব কথা বলতে পারি ?

পান্না বুঝতে পারে। চুপ করে থাকে। আর কোন প্রশ্ন করে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বুড়ো জগন্নাথই আবার বলতে শুরু করে, আগে ভাবতাম পড়া-লিখা জানা লোকেরা ভাল হয় এখন দেখছি সব পড়া-লিখা জানা লোকেরাও ভাল হয় না। অনেকেই কিষাণ-শুকদেবের চাইতেও খারাপ।

পান্না এবার বললো, অথচ দেখ আমাদের বড় সাহেবকে। কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও...

আরে দিদি, বড় সাহেব তো দেবতা আছে। ওর কথা বাদ দাও।

ঠিক বলেছ বড়ে ভাইয়া। আমি ওর নোকরানী কিন্তু আমাকে পর্যন্ত কি ইজ্জত দিয়ে কথা বলেন তা তোমাকে বলতে পারবনা।

পান্না ঠিকই বলেছে। সেই সেবার জ্বর সেরে যাবার পর কলকাতা যাবার সময় পান্না একশ টাকার নোটখানা না নেওয়ায় বড় সাহেব সত্যি বিস্মিত হয়েছিলেন। পরের বার শঙ্করগড় এসেই বড় সাহেব ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পান্না তুমি কত মাইনে পাও ?

চল্লিশ টাকা বড়ে সাব।

বড় সাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, সবাই আমার কাছে চায়—টাকা চায়। কেউ বেশী, কেউ কম। আমারও এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, না চাইলে আমারও কিছু দিতে ইচ্ছে করে না।

পান্না চুপ করে মুখ নিচু করে শুনছে।

গতবার তোমাকে কিছু দিতে গেলেও যখন নিলে না, তখন ..

বড় সাব, অন্যায় হলে মাফ করবেন।

না, না, অন্যায় কিছু হয় নি, বরং তোমার মর্যাদা বোধ আমার খুব ভাল লেগেছে।

তখন বেশী কথা বলার সময় ছিল না। বড় সাহেব জামা-কাপড় পরে তৈরী হতে না হতেই রায় সাহেব এলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজন বেরিয়ে গেলেন। দুপুরবেলায় দু-তিনজনকে নিয়ে এলেন। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর এক মিনিটও বসলেন না। সারা দিনের কাজকর্ম সেরে যখন ফিরলেন, তখন প্রায় আটটা বাজে।

বড় সাহেব ড্রইংরুমে বসতেই পান্না এক গেলাস ঠাণ্ডা সরবত এগিয়ে দিল।

বড় সাহেব গেলাসটা ধরেই হাসতে হাসতে বললেন, আসার সঙ্গে সঙ্গেই সরবত।

খানিকটা আগে বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম।

আর কোন কথা না বলে উনি সরবত খেয়ে নিলেন। ওর হাত থেকে খালি গেলাসটা নিতে নিতেই পান্না এক ঝলক ওকে দেখেই বুঝল বড় সাহেব খুব খুশি হয়েছেন।

রাতে খেতে খেতে বড় সাহেব বললেন, আচ্ছা পান্না, গতবার কি আমার খুব জ্বর হয়েছিল?

জী বড়ে সাব।

সারা রাতই তুমি জেগেছিলে, তাই না ?

ঠিক সারা রাত না। বোধ হয় চারটে-সাড়ে চারটে পর্যন্ত।

বড় সাহেব হেসে ফেলেন, সারা রাতের আর বাকি থাকল কোথায় ?

পান্না চুপ করে থাকে।

বড় সাহেবও আর কোন কথা না বলে খেয়ে-দেয়ে নিজের ঘরে চলে যান।

তু-এক মিনিট পরে এক গেলাস জল আর ওষুধ নিয়ে বড় সাহেবের শোবার ঘরে হাজির হয়ে বলে, এই দাবাই খেয়ে শুয়ে পড়ুন। আজ আর কিতাব-টিতাব পড়বেন না।

কেন ?

সারা দিন তো একটুও আরাম করেন নি।

আমি কলকাতার ছেলে। এত সকাল সকাল ঘুমুতে পারি না।

হঠাৎ পান্না প্রশ্ন করে, আচ্ছা বড়ে সাব, কলকাত্তা খুব বড়া শহর ?

বড় সাহেব মুখ তুলে পান্নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কলকাতা যাবে ?

অমনভাবে সোজাসুজি বড় সাহেব কোনদিন ওর দিকে তাকান নি। পান্না লজ্জায় মুখ নীচু করে বললো, না, না, আমি কলকাতা যাবার কথা বলছি না।

তুমি তো কোন বড় শহর দেখ নি, তাই না ?

ও মাথা নেড়ে জানাল, না !

ঠিক আছে, তোমাকে আমি বড় শহর দেখিয়ে দেব।

নেই বড়ে সাব, আমার মত নোকরানী বড়া শহরে গিয়ে কি করবে ?

কি আবার করবে ? এমনি বেড়িয়ে আসবে। আমিই একবার সঙ্গে নিয়ে যাব।

ও কথা বলবেন না বড়ে সাব।

কেন?

আপনি দেবতা আছেন। আপনার সঙ্গে কি আমি যেতে পারি?

আমার শরীর খারাপ বলে সারা রাত জেগে আমাকে দেখাশুনো করতে পারলে, আর আমি তোমাকে···

ও কথা বার বার বলবেন না বড়ে সাব। আমার শরম লাগে।

আচ্ছা তুমি খেয়ে এসো। তারপর কথা হবে।

আপনি আরাম করুন বড়ে সাব।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বড় সাহেব বললেন, সারা দিন শুধু কাজ আর রাতে আরাম করে মন ভরে না। বরং একটু কথাবার্তা বললেই ভাল লাগবে। হঠাৎ বড় সাহেব একটু হাসলেন। বললেন, শুধু টাকাকড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা শুনে শুনে আর ভাল লাগে না।

পান্না মুখ নীচু করে শোনে।

জান পান্না, আমি বরাবর সাইকেল চড়ে স্কুল-কলেজ গেছি। আমাদের বাড়ী থেকে ইউনিভার্সিটি অনেক দূরে বলে এম-এ পড়ার সময় ট্রামে যেতাম। সাইকেল চড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে কিন্তু চড়তে পারি না।

কেন?

এখন তো আমি ছাত্র নই। এখন যে আমি অনেক টাকার মালিক, বড় সাহেব। এখন সাইকেল চড়লে কি কেউ আমাকে সম্মান করবে? বড় সাহেব একটু মুচকি হেসে বললেন, এখন শুধু কর্তব্য আর কাজ করি, নিজের মন যা চায় তা করতে পারি না।

পান্না শুনছে। বড় সাহেবও একটু থামলেন। তারপর আবার

বললেন, বলাই নন্দী বলে আমার এক বন্ধু আছে। আমরা দু-জনে বরাবর একসঙ্গে স্কুলে-কলেজে পড়েছি। ও আমার সব চাইতে প্রিয় বন্ধু কিন্তু এখন লুকিয়ে-চুরিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি।

কেন বড়ে সাব?

বলাই সরকারী অফিসের টাইপিস্ট, আর আমি যে বড়লোক। তার বাড়ীতে গেলে আড্ডা দিলে আমাদের পরিবারের সম্মান চলে যাবে যে।

সাচ বড়ে সাব?

তবে কি আমি মিথ্যে বলছি?

না, না, আমি তা বলছি না মাগার...

তাহলে একটা ঘটনা শোন। তখনও কলেজে পড়ি। আমি আমাদের একটা গাড়ীতে বলাই-এর ভাইবোনকে নিয়ে দুর্গাপুজার সময় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। আমাদের পরিচিত কেউ নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। আর তার ফলে আমাদের সমাজে কি রটে গেল জান?

কি বড়ে সাব?

রটে গেল আমি বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করছি।

আচ্ছা!

বড় সাহেব একটু হেসে বললেন এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি—একি কলকাতার বাড়ীতে পারতাম? পারতাম না। অসম্ভব।

অনেক রাত হলো। এবার আপনি আরাম করুন, বড়ে সাব।

আমার একটুও ঘুম পায় নি। তা ছাড়া এ সব কথা তো কাউকে বলতে পারি না। তাই বেশ লাগছে।

কিন্তু কাল সুবা নাস্তা করেই তো আবার সারাদিন কাজ করবেন। এখন আরাম না করলে...

কাল সারাদিন যদি আরাম করি ?

অবিশ্বাস্য প্রশ্ন শুনে পান্না হাসে। পালটা প্রশ্ন করে, আপনি সারাদিন আরাম করবেন ?

আমি সারাদিন কোঠিতে থাকলে তোমার কোন অসুবিধে হবে ?

বড় সাহেবের কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে পান্নার মুখ। বলে, একি কথা বলছেন বড়ে সাব ?

আমি এমনি বলছি।

সত্যি কাল সারাদিন কোঠিতে থাকবেন ?

তুমি বল।

আপনার মর্জি বড়ে সাব।

আমি থাকলে তুমি খুশি হবে ?

মিষ্টি চাপা হাসি হেসে শুধু মাথা নেড়ে পান্না জানাল, হ্যাঁ।

যাও, তুমি খেতে যাও।

আপনি দাবাই খেয়ে নিন।

তুমি খেয়ে এসে দিও।

আপনার নীদ আসছে না ?

না, আজ আমার চোখে ঘুম আসছে না। তোমার ঘুম পাচ্ছে ?

আবার পান্না মাথা নেড়ে জানাল, না।

পাঁচ

এক রাতের তীব্র বর্ষণেই শীর্ণ নদী পূর্ণ হয়। আগে বিশ্বাস করা যায় না কিন্তু পরে চমকে উঠতে হয়। ঐ এক রাতের সেবাযত্নের পর আকাশ-পাতালের দূরত্ব এভাবে কমে যাবে, পান্না আশা করে নি। ভাবতে পারে নি। কিন্তু যা ভাবা যায় না, আশা করা যায় না, তাই তো জীবন। প্রকৃতির রূপ বদলের চরিত্র বিবর্তনের নিয়ম আছে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত আসা-যাওয়ার নিয়ম আছে কিন্তু মানুষের জীবনের ঋতুরঙ্গের কোন নিয়মকানুন নেই। শীতের শেষে গাছের পাতা ঝরে যায়; বসন্তে নতুন করে পল্লবিত হয়, কিন্তু পান্নার জীবনে বসন্তের শুরুতেই সব পাতা ঝরে গেল। সবুজের মুখোমুখি হয়েও সে শুধু চোখের জল আর রুক্ষতা নিয়েই পার্শেল এক্সপ্রেসে চড়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে মথুরার কাছে ফিরে এল। পান্না কি স্বপ্নেও এই দুর্দিনের কথা ভেবেছিল?

না।

ভেবেছিল মধুমতীর মত ও নিজেও স্বামীর প্যার পাবে। ওর মুন্না হবে, মুন্নী হবে। তারা হাসবে, খেলবে, মারামারি করবে। পান্না ওদের বকুনি দেবে, আদর করবে, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গান গাইতে গাইতে ঘুম পাড়াবে। এ স্বপ্ন দেখা কি অন্যায়?

না। কিন্তু তবু সেই স্বাভাবিক, সাধারণ সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও ভোগ করতে পারল না। পারল না আরো অনেক কিছু।

চুপ করে বসে বসে পান্না ভাবে, সেই ছোটবেলার শঙ্করগড়, ওর:

প্রথম যৌবনের শঙ্করগড় কিভাবে বদলে গেল। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত বড় সাহেব যেন ম্যাজিক দেখালেন কিন্তু সেদিনের সেই চকচকে কারখানাও যে এভাবে কালো হবে তা ও ভাবতে পারে নি।

শুধু কারখানা আর ঘরবাড়ীর বাইরের চেহারা নয় মানুষগুলোর জীবনেও কত কি ঘটল। স্টোরবাবু সুকুমার দত্তর সংসার জোড়া লেগেও আবার ভেঙে গেল। রামপেয়ারীকে নিয়েই বর্মনবাবুর বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে শঙ্করগড়ের মানুষের অসন্তোষ জমতে জমতে একদিন ডিপোর মাঠের সভায় ফেটে পড়ল। শুধু ইউনিয়ন নয়, শঙ্করগড় ছেড়ে চলে গেলেন বর্মনবাবু।

আর রামপেয়ারী ?

বর্মনবাবু চলে গেলেও চিরদিনের জন্য তার স্মৃতি রেখে গিয়েছেন রামপেয়ারীর কাছে। ঐ ছোট্ট অবোধ শিশুটাকে কোলে নিয়ে নিয়ে রামপেয়ারী দাসীবৃত্তি করে বেড়ায় বাবুদের বাড়ীতে।

একদিন রাস্তায় রামপেয়ারীর সঙ্গে দেখা হতেই পান্না বললো, তুই এবার একটা সাদি কর।

রামপেয়ারী যেন ভয়ে আঁতকে উঠল, না, না. আমি সাদি করব না।

সাদি না করলে এভাবে তুই কত কাল কাটাবি ?

নারে পান্না. তুই আমাকে সাদির কথা বলিস না।

কিন্তু ..

রামপেয়ারী আর চোখের জল সামলাতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে বলে, অনেক বেইমানী করেছি কিন্তু আর পারব না। হঠাৎ পান্নার দুটো হাত চেপে ধরে বলে, তুই বল, এই ছেলেটা যদি আমাকে বেইমানী করতে দেখে তাহলে তো ও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তখন ? আমি কি করে বাঁচব বল পান্না ?

পান্না চুপ।

রামপেয়ারী নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললো, সবার সঙ্গে বেইমানী করেছি কিন্তু নিজের বেটার সঙ্গে বেইমানী করতে পারব না।

রামপেয়ারী আর দাঁড়ায় না। চলে যায়। পান্নাকে কিছু না বলেই চলে যায়। কিন্তু পান্না চলে যেতে পারে না। স্তব্ধ বিস্ময়ে অচল অব্যয়ের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে। বর্মনবাবুর কথা ভাবে, রামপেয়ারীর কথা ভাবে। আর ভাবে ঐ নিষ্পাপ শিশুটার কথা। মনে মনে শত কোটি প্রণাম জানায় বাবা শঙ্করনাথকে। নিঃশব্দে প্রার্থনা করে, রামপেয়ারীর স্বপ্ন সার্থক হোক, এই শিশুটা মানুষ হোক।

পান্না একবার ভেবেছিল বড় সাহেবকে রামপেয়ারীর দুঃখের কথা বলবে। অনুরোধ করবে; প্রার্থনা করবে ওর জন্য, ওর বাচ্চার জন্য কিছু করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড় সাহেবকে ও কিছুই বলে নি। মনে হয়েছে, না, দয়া করে, দাক্ষিণ্য দেখিয়ে ও রামপেয়ারীকে ছোট করতে পারবে না। রামপেয়ারীর অতীত যাই হোক, বর্তমানে তার একমাত্র পরিচয় সে মা। সে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন জননী। তাকে দয়া করার অধিকার কারুর নেই। মনে হয়েছে, রামপেয়ারী লড়াই করুক। দুঃখের আগুনে ওর অতীতের সব গ্লানি পুড়ে ছাই হয়ে যাক। ও সমস্ত অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, সীতার মত সম্মান পাবেই। আর অজ্ঞাতকুলশীল ঐ শিশুটা শুধু মায়ের দেওয়া ঐশ্বর্য নিয়েই একদিন শঙ্করগড়ের মানুষকে স্তম্ভিত করে দেবে।

·

বড় সাহেব আজকাল পান্নাকে অনেক কথাই বলেন। সেদিন

কথায় কথায় বর্মনবাবুর কথা উঠল। বড় সাহেব বললেন, ছেলেটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। যে কাজ অন্য দশজনে পারবে না, সে কাজ ও অনায়াসে করতে পারে। আমি ওকে সত্যি ভালবাসি। ওকে অনেক সুযোগ-সুবিধেও দিয়েছি কিন্তু যখন শুনলাম বউ-ছেলেমেয়েকে টাকা পাঠানও বন্ধ করে দিয়েছে…

পান্না চমকে ওঠে, বর্মনবাবুর বিবি-বাচ্চা আছে?

বউ আছে, তিন-চারটে বাচ্চা আছে, বুড়ো বাবা-মা…

সে কি? আমরা তো শুনতাম উনি সাদিই করেন নি।

তাই বুঝি ও এখানে আজেবাজে মেয়েকে নিয়ে বাঁদরামী শুরু করেছিল? বড় সাহেব একটু জোরে নিশ্বাস ফেলে বললেন, দেখ পান্না, অধিকাংশ মানুষই একটু স্ফূর্তির সুযোগ পেলে মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

ঠিক বলেছেন বড়ে সাব। আপনার দয়ায় শঙ্করগড়ের মানুষ কিছু টাকা-কড়ি পেয়ে কি আশ্চর্যভাবে বদলে গেল, ভাবলেও অবাক লাগে।

শঙ্করগড়ের মানুষের দোষ নেই। সবাই বদলে যায়। আমার বাবাকে দেখেই আমি অবাক হয়ে যাই।

কথাটা শুনেই পান্না একটু অস্বস্তি বোধ করল। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য জিজ্ঞাসা করল, বড়ে সাব, খানা দেব?

বড় সাহেব পান্নার কথা শুনতেও পান না। জানলা দিয়ে কারখানার বড় চিমনিটার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন ভাবেন। ভাবতে ভাবতে ওর সুন্দর সৌম্য মুখখানা ম্লান হয়ে যায়। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, আমার বাবা অতি সাধারণ ব্যবসাদার ছিলেন কিন্তু যুদ্ধের বাজারে…

পান্না অবাক হয়ে বলে, যুদ্ধ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যুদ্ধ। আমি যখন খুব ছোট তখন ইংরেজের সঙ্গে

জাপান-জার্মানির দারুণ লড়াই হয়েছিল। সেই যুদ্ধের সময় সরকারকে মাল সাপ্লাই দেবার কাজে বাবা লাখ লাখ টাকা লাভ করতে শুরু করলেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর দেখা গেল বাবা কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন।

পান্না কোন প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সব বড় বড় শহরে আমাদের বাড়ী হলো। কত মোটরগাড়ী হলো। কারখানা হলো। বাড়ীর সবাই খুশী। হঠাৎ পান্নার দিকে তাকিয়ে বড় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, নিজের খুশীর জন্য আমার বাবা কি করলেন শুনবে ?

পান্না চোখে প্রশ্ন কিন্তু মুখে কিছু বললো না। বিস্ময়ে বড় সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল।

বড় সাহেব একটু শুকনো হাসি হেসে বললেন, নিজের খুশীর জন্য কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ আর বেনারসে এক একটা মেয়েছেলে রেখে দিলেন।

শুনে পান্নার মুখটা একটু বিকৃত হয়ে গেল।

তুমি অবাক হচ্ছো ? কিচ্ছু অবাক হবার নেই। তুমি কোটিপতি হয়ে রোজ এক একটা পুরুষের সঙ্গে রাত কাটালেও তোমার স্বামী কিছু বলবে না। টাকা থাকলে সবাই সার্কাসের জোকারের মত দাঁত বের করে হাসবে।

মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর বড় সাহেব বললেন, সব বড় বড় ব্যবসাদারদের এই একই কাহিনী। টাকা ওড়াবার জন্য সব হতচ্ছাড়া মেয়ে পুষছে।

সবাই ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবাই। আমার ভাইদেরও...

কি বলছেন বড়ে সাব ?

ঠিকই বলছি পান্না। একটু মুচকি হাসি হেসে বললেন, ভাবছ আমারও কি নেই ?

নেই বড়ে সাব নেই।

তোমার ভাবাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমার বন্ধু বলাই কি বলে জান ?

কি ?

বলে, যদি কাউকে ভাল না বেসে তার সঙ্গে বিছানায় শুয়েছিস তাহলে তোর সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ।

আপনার দোস্ত ঠিক বলেছেন।

বড় সাহেব একটু হেসে বললেন, বলাই আমাকে ভয় করে না, ভালবাসে। সত্যি ভালবাসে। নিজের ভাইয়ের মত ভালবাসে। তাই ও আমাকে সব সময়ই এইরকম কথা বলে।

সত্যিকার দোস্ত একেই বলে।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই পান্না। বড় সাহেব এবার পান্নার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার কাছে তোমার কথা শুনে বলাই কি বলেছে জান ?

কি ?

বড় সাহেব হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, আমি নাকি তোমাকে ভালবাসি।

লজ্জায়, দ্বিধায়, সঙ্কোচে পান্না যেন মরে গেল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করল, খানা দেব ?

দাও।

খেতে খেতে বড় সাহেব বললেন. সবাই জানে কলকাতার গণ্ডগোলের জন্য আমি এখানে কারখানা করেছি, কিন্তু তা ঠিক নয়। কলকাতায় টুকটাক গণ্ডগোল চিরকালই ছিল, এখনও আছে। ওসব গণ্ডগোলে আমরা অভ্যস্ত। গণ্ডগোল কি এখানে নেই ?

জরুর আছে।

এই তো অফিস থেকে আসারআগেই শুনলাম আমাদের স্টোরবাবু সুকুমার দত্ত শুকদেব বলে কোন এক লেবারারের·বউকে নিয়ে…

পান্না আর ধৈর্য ধরতে পারে না জিজ্ঞাসা করল, ·কি হয়েছে বড়ে সাব ?

কি আর হবে ? স্টোরবাবুকে ছুরি মেরেছে।

জিন্দা আছেন ?

বদলোক সহজে মরে না।

বড় সাহেবের কথায় পান্না হাসে।

হাসছ যে ? সত্যি বলছি খারাপ লোক চট করে মরে না। অনেক কাল অনেককে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ওরা মরে।

পান্না তবু হাসে।

বড় সাহেব বললেন, তাহলে তোমাকে একজনের কথা বলি। শোন। আমাদের নাগপুরের ওদিকের কয়লাখনিতে উনি বহুকাল কাজ করেছেন। আমি ছোটবেলা থেকেই দেখছি উনি একটা কয়লাখনির বড়বাবু। ছোটবেলায় যখন বাবার সঙ্গে ঘুরতে গেছি তখন দেখেছি বাবা ওকে যথেষ্ট খাতির করেন। পরে আমি যখন ঐ কয়লাখনির দেখাশুনা শুরু করলাম তখন দেখলাম। লোকটা এক নম্বরের চোর কিন্তু অত্যন্ত কাজের।

চোর কখনও কাজের লোক হয় বড়ে সাব ?

সাধারণ চোররা কাজের লোক হয় না, কিন্তু ভদ্রবেশী পাকা চোররা অত্যন্ত কাজের লোক হয়। যেমন আমাদের এখানকার ঘোষবাবু বা সুকুমার দত্ত।…

পান্না চমকে ওঠে, ঘোষবাবু বা সুকুমারবাবু চুরি করেন ?

বড় সাহেব হেসে বলেন, চমকে উঠবে না। যা বলছি শোন।

কিন্তু তাই বলে…

বড় সাহেব ওকে আর বলতে না দিয়েই বললেন, স্টোরের স্নকুমার দত্ত এক নম্বরের চোর আছে, সে কথা কারখানার সবাই জানে কিন্তু ঘোষবাবুর চুরির কথা শুধু আমরা দু-তিনজন জানি। এবার বড় সাহেব একটু হেসে বললেন, এই কারখানা তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষবাবু কলকাতায় একটা তিন তলা বাড়ী বানিয়েছেন, তা জান ?

তাহলে ওদের রেখেছেন কেন ?

স্টোরের সব লোকই চোর হয়। কেউ কম, কেউ বেশী। তাই স্নকুমারকে তাড়াই না। আর ঘোষবাবু এত কাজের যে উনি না থাকলে হয়ত কারখানাই চালানো মুশকিল হবে।

শুনে পান্না হাসে।

বড় সাহেব একটু হেসে বললেন, যার কথা বলছিলাম তাই শোন। আস্তে আস্তে জানতে পারলাম, লোকটা এক নম্বরের বদমাইস। বহু মানুষের, বিশেষ করে মেয়ে কুলিদের সর্বনাশ করেছে। তারপর লোকটা কিভাবে মারা গেল জান ?

কিভাবে ?

যথারীতি একটা মেয়ে কুলির সঙ্গে স্ফূর্তি করে রাত্রে নিজের কোয়ার্টারে ফিরছিল একটা পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ পা ফসকে নীচে পড়ে যায়। হাত-পা ভেঙে সারা রাত ঐ পাহাড়ের নীচে পড়ে রইল।

ঠিক হয়েছিল।

আগে সব শোন তারপর কথা বলো। পরের দিন দুপুরে একদল কুলি ওকে দেখেও হাসপাতালে নিয়ে গেল না। শেষ পর্যন্ত অফিসের দু-জন বাবু বিকেলের দিকে বাড়ী ফেরার পথে ওকে ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু এমনই কপাল যে, সেদিন ডাক্তারবাবু বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে নাগপুর গিয়েছিলেন।

পান্না আর ধৈর্য ধরতে পারে না। হেসে বলে, যেমন কর্ম, তেমন ফল।

কিন্তু লোকটা মরল কতদিন পরে জান?

কতদিন পরে?

তিন মাস হাসপাতালে থাকার পর মরল।

ঠিক হয়েছে।

তাই তো বলছিলাম বদ লোক চট করে মরে না, কিন্তু সৎ লোক হাওয়াই বাজীর মত হঠাৎ চলে যায়। বড় সাহেব পান্নার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার বাবা কেমন হঠাৎ মারা গেলেন দেখলে? ওসব লোক নিজেও কষ্ট পায় না, অন্যকেও কষ্ট দেয় না।

পান্না হঠাৎ আনমনা হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বড় সাহেব চলে যাবার পর বুড়ো চৌকিদার জগন্নাথ ওকে অনেক কিছু বলেছিল।

দেখ দিদি, আমি সামান্য চৌকিদারি করি। বড় সাহেবের কোঠি পাহারা দিই, কিন্তু রাত্তির বেলায় যা সব দেখি তাতে মনে হয় কারখানার বড় বড় মিস্ত্রী বা অফিসের বাবুদের চাইতে···

রাত্রে কি দেখ বড়ে ভাইয়া?

দিনের বেলায় যাদের সাধু ভাবি রাত্রে তারাই মদ খেয়ে মাতলামী করে, মেয়ে কুলিদের জড়িয়ে ধরে, জোর করে টেনে নিয়ে যায়···

সে কি?

হ্যাঁ দিদি, এদের যত দেখছি তত বেশী ঘেন্না করছি। মাঝে মাঝে মনে হয় এ কারখানা না হলেই বোধ হয় ভাল ছিল।

না, না, বড়ে ভাইয়া ও কথা বলো না। এ কারখানা হয়েছে বলে কত শত শত লোকের সংসার চলছে, কতজনে সুখে আছে, কত ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখছে···

তা তো বটেই।

তা ছাড়া সবাই তো খারাপ নয়। অনেক ভাল লোকও তো আছে।

আছে বৈকি! বুড়ো চৌকিদার ছানি পড়া চোখ ছুটো বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করল, তুমি ব্যানার্জীবাবুকে চেনো?

কোন ব্যানার্জীবাবু?

টাইম অফিসের ব্যানার্জীবাবু।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি।

সত্যি ওর মত ভদ্রলোক খুব কম দেখেছি। ওর নাইট ডিউটি থাকলে উনি রোজ রাত একটা-দেড়টার সময় একবার বাড়ী যান।···

কেন?

ওর মার শরীর যে খুব খারাপ!

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তাই তো একবার ঐ সময় মাকে দেখতে যান। আর যান আমাদের এই কোঠির পাশ দিয়েই। উনি যাতায়াতের পথে কোন মেয়ে কুলিকে নিয়ে টানাটানি করতে দেখলেই আগে ঐ লোকটাকে একবার জুতোর বাড়ী মারবেন। তারপর, বলবেন, এরা কুলি বলে কি কারুর মা-বোন না?

আচ্ছা!

হ্যাঁ দিদি। লোকটা যেমন ভদ্র তেমন সাহসী। একদিন স্টোরবাবু সুকুমার দত্তকে ধরে এমন ধোলাই দিয়েছিলেন যে, দত্তবাবুকে তিন দিন ছুটি নিয়ে···

কি বলছ বড়ে ভাইয়া?

ঠিকই বলছি। আর দু-চারটে ব্যানার্জীবাবু থাকলে সারা শঙ্করগড় ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

পান্না চুপ করে থাকে।

কিছু দিন পরে পান্না একবার বড় সাহেবকে দত্তবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বড় সাহেব বলেছিলেন, ওর চাইতে সৎ লোক এই কারাখানায় নেই। ওকে স্টোরবাবু করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও রাজী হলো না।

কেন ?

বললো, না, বড় সাহেব, ও বড় চুরির জায়গা। আমি যাব না।

এরকম লোক আমাদের কারখানায় আছেন ?

আছেন বৈকি। শুধু অসৎ লোক দিয়ে কি এত বড় কারখানা চলে ?

তা ঠিক।

বুড়ো চৌকিদার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, দিদি, ফ্যাক্টরী চালু হবার দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, শঙ্করগড়ে এবার ইনকিলাব— ক্রান্তি এলো। ক্রান্তি এসেছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এ সব উপরি পাওনাও আমাদের ভোগ করতে হবে তা তো কোনদিন ভাবি নি।

বড়ে ভাইয়া সব সুখের মধ্যেই কিছু না কিছু দুঃখ থাকেই। যেদিন মধুমতী সাদির পর শশুরাল গেল, সেই আনন্দের দিনেও তো তোমার চোখের জল পড়েছিল, তাই না ?

বুড়ো জগন্নাথ একটু হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ দিদি, তা তো পড়েছিল।

পড়বেই। শুধু সুখ বা শুধু দুঃখ ভগবান দেন না।

জান দিদি, এবার হোলিতে নাকি নটঙ্গীর নাচ হবে।

পান্না হাসে, বলে বড়ে ভাইয়া, যাদেরই একটু পয়সা আছে তারাই নটঙ্গীর নাচ দেখে।

কিন্তু তাই বলে আমাদের শঙ্করগড়ে ?

আগে পয়সা ছিল না বলে শঙ্করগড়ে নটঙ্গী আসে নি, কিন্তু এখন কেন আসবে না ? তুমি সব কিছুতেই দুঃখ পেও না বড়ে ভাইয়া।

বুড়ো চৌকিদার আর তর্ক করে না। চুপ করে থাকে।

শঙ্করগড়ের মানুষের জীবনের গতি নাটকীয়ভাবে কখনও এগুচ্ছে, কখনও পেছিয়ে যাচ্ছে, কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে। মানুষের জীবনে যাই হোক না কেন, কারখানার নাটক একইভাবে এগিয়ে চলেছে। মালগাড়ী বোঝাই করে লাইমস্টোন, জিপসাম, কয়লা আর ক্লে আসছে, নামছে ডিপোর পাশে, শূন্য ওয়াগন ভর্তি হচ্ছে অযোধ্যা সিমেণ্ট কোম্পানীর হাজার হাজার বস্তা সিমেণ্ট দিয়ে। স্কুলের আগে, ছুটির পরে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা খানিকটা বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই সব মালগাড়ীর আসা-যাওয়া দেখে, আর বিকেলবেলায় কলোনীর মাঠে রেলগাড়ী-রেলগাড়ী খেলে। হীরার কোয়ার্টার থেকে ফেরার পথে পান্না ওদের দেখে আর মনে মনে হাসে। হঠাৎ হাসি হারিয়ে যায় মন থেকে, গম্ভীর হয়, ভাবে। এরা যা দেখবে তাই তো শিখবে। এরাই বড় হয়ে অযোধ্যা সিমেণ্ট কোম্পানীর কুলি-মজুর-মিস্ত্রী হবে। কেউ বা হয়ত অফিসের বাবু হবে। কিন্তু কেউ তো কিষাণ, শুকদেব, বর্মনবাবু, স্টোরবাবুও হবে ? যদি কেউ রামপেয়ারীর মত গিরিজার

চায়ের দোকানে গিয়ে শিকার খুঁজতে যায়? যদি কেউ শুকদেবের বউয়ের মত কোন বাবুর সুখের সংসারে আগুন লাগায়?

ভাবতে গিয়ে ওর মাথাটা ঘুরে উঠল। হঠাৎ চোখে সব কিছু অন্ধকার দেখল। তারপর আস্তে আস্তে এগুতে এগুতে আবার কারখানার ঐ লম্বা কালো চিমনিটা ওর নজরে পড়ল। ভাবল, এ সংসারে সবাই তো মধুমতীর মত সুখী হতে পারে না। কেউ ওর মত দাসী হবে, কেউ রামপেয়ারী হবে।

আচ্ছা বড়ে সাব। কলকাত্তা-বোম্বাই থেকে এখানে এসে আপনার খারাপ লাগে না?

বড় সাহেব একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

না পান্না, এখানে এসেই বরং ভাল থাকি।

কেন বড়ে সাব? প্রশ্ন করেই পান্না ভীষণ লজ্জিত হলো।

আমাদের কলকাতার বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টাই শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকাকড়ি আর লাভ-লোকসানের গল্প। সব সময় কি এই সব শুনতে ভাল লাগে? বিরক্ত লাগে, ঘেন্না লাগে।

ইচ্ছা করলেও পান্না চলে যেতে পারছে না। অত্যন্ত দ্বিধা সঙ্কোচের সঙ্গে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বড় সাহেবই আবার কথা বললেন, যখন আর সহ্য করতে পারি না তখন বলাই-এর কাছে চলে যাই।

বলাইবাবু আপনাকে খুব ভালবাসে?

ক্লাস টু থেকে বি-কম পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি। ভালবাসবে না ?

এত ভাল দোস্তকে আপনার কোম্পানীতে একটা ভাল নোকরি দিলেন না কেন বড়ে সাব।

না পান্না, সে ক্ষমতা আমার নেই। বন্ধুবান্ধবকে চাকরি দেওয়া আমার পিতাজী পছন্দ করেন না। ওঁর ধারণা, বন্ধুবান্ধবকে চাকরি দিলে কোম্পানীর কাজ ভালভাবে হবে না।

বড়ে সাব!

কি ?

একবার বলাইবাবুকে এখানে নিয়ে আসবেন ?

ওর অফিস থেকে ছুটি পাওয়া খুব মুশকিল। তাই তো ওকে আনতে পারি না। তবে ওকে তোমার কথা বলেছি।

কি বলেছেন বড়ে সাব ?

বড় সাহেব একটু হাসলেন। একবার পান্নার দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, বলেছি তুমি খুব ভাল মেয়ে, তুমি আমাকে খুব যত্ন কর, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।

কথাগুলো শুনেই পান্নার হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে ওঠা-নামা শুরু করল যে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, বড়ে সাব, এ সব কথা বলবেন না। আপনি দেবতা আছেন আর আমি আপনার দাসী আছি।

পাথরের মূর্তির মত পান্না চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বড় সাহেবও মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বড় সাহেব ডাকলেন, পান্না!

জী।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনেক অন্যায়, অনেক খারাপ কাজ আমি করি, করতেই হয়। কারখানা চালিয়ে লাখ লাখ টাকা বাড়ীতে না দিলে আমাকে হয়ত বাবা-মা তাড়িয়ে দেবেন, কিন্তু এমনি এমনি আমি মিথ্যে কথা বলি না।

গলতি মাপ করবেন বড়ে.সাব। আমি তা বলি নি।

বড় সাহেব যেন ওর কথা শুনতেই পেলেন না। আপন মনেই বলে চললেন, পান্না সত্যি তোমাকে আমার ভাল লাগে।

বড়ে সাব!

এই পৃথিবীতে বলাই আর তুমি ছাড়া কেউ নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে না। সবাই শুধু স্বার্থের জন্যই···

বড়ে সাব, অনেক রাত হয়েছে। খানা দেব?

বড় সাহেব আজ শুনতে চান না। শুনতে পারছেন না। আজ ওর বলার দিন। যেদিন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, যেদিন পৃথিবীর গহ্বর থেকে হাজার হাজার বছরের অব্যক্ত বেদনা, চোখের জল আচমকা হঠাৎ বেরিয়ে আসে, সেদিন মাটির পৃথিবীর উপরের কিছু মানুষের সুখ-দুঃখের খোঁজ নেবার অবকাশ তার থাকে না।

পান্না!

জী বড়ে সাব।

একটু কাছে এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মত পান্না একটু এগিয়ে এল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই বড় সাহেব একটা হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত ধরলেন। একটু কাছে টানলেন।

পান্না!

জী বড়ে সাব।

একটু আমার কাছে বসবে?

না, না, বড়ে সাব এ কথা বলবেন না।

আমি বর্মনবাবু না পান্না।

ছি ছি বড়ে সাব, আমি তা বলি নি। আমাকে মাফ···

আমি জানি তুমিও রামপেয়ারী না। তুমি আমার স্ত্রীর মত খারাপও না।

পান্না হঠাৎ একটু জোরেই বলে উঠল বড়ে সাব!

বড় সাহেব একটু হেসে বললেন, বলেছি তো পান্না, আমি মিথ্যে কথা বলি না। বড়লোক কোটিপতিদের বাড়ীতে যে কত নোংরামী টাকার নীচে লুকিয়ে থাকে তা তুমি ভাবতে পারবে না। বর্মনবাবুর কথা, রামপেয়ারীর কথা সবাই জানতে পারে, কিন্তু আমি কলকাতায় না থাকলে যে আমার বউ আমার চাচার ছেলের ঘরে রাত কাটায়··

বড়ে সাব! এ সব কথা আমাকে বলবেন না, আমি শুনতে পারি না।

পান্নার একটা হাত তখনও ওর হাতের মধ্যে। সেই হাতখানা নাড়চাড়া করতে করতে বললেন, পান্না, তুমি আমাকে দেবতা ভাবলেও আমি মানুষ। আমার টাকা আছে কিন্তু আর কিচ্ছু নেই। আমারও ইচ্ছে করে কেউ আমাকে ভালবাসুক, আদর করুক। ইচ্ছে করে আমিও কাউকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি, আদর করি, ভালবাসি।

পান্নার একফোঁটা চোখের জল হাতে পড়তেই বড় সাহেব চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে দু-হাত দিয়ে ওর দুটো হাত ধরে আরো কাছে টেনে নিলেন। পান্নার শাড়ীর আঁচল দিয়েই ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, কাঁদছ কেন? কেঁদো না। আমি বড়লোক কিন্তু বাংলাদেশে মানুষ হয়েছি বলে মানুষের চোখের জল দেখলে আমারও চোখে জল আসে, কষ্ট হয়। বলাইয়ের মেজ মেয়েটা যখন মারা যায় তখন···

বড় সাহেব আর বলতে পারলেন না। দুটো চোখ জলে ভরে গেল। গড়িয়ে পড়ল চিবুক বেয়ে।

পান্না সহ্য করতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতেই নিজের আঁচল দিয়ে বড় সাহেবের চোখের জল মুছিয়ে দিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার বড় সাহেবের দুটি চোখ বেয়ে চোখের ধারা গড়িয়ে পড়ল। কাঁদতে

কাঁদতেই বললেন, বলাই জীবনে শুধু একবার আমার কাছে টাকা চেয়েছিল। মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্য নিজের সর্বস্ব খুইয়ে এসে আমার কাছে হাত পেতেছিল। আমি দু-পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছেই দেখি হাসপাতালের সিঁড়ির উপর বসে বলাই আর ওর স্ত্রী পাগলের মত কাঁদছে।

পান্নার চোখেও জল। সে আর বড় সাহেবের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারছে না।

কাঁদতে কাঁদতেই খুব জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বড় সাহেব বললেন, পান্না, আমাদের পাপের টাকায় কি কোন মানুষের কল্যাণ হতে পারে? না, কখনই না। বলাইয়ের পকেটে একটা টাকাও ছিল না। তবু ঐ সোনার টুকরো মেয়েটার দাহ করার জন্য আমি ওকে একটা কানাকড়িও দিলাম না। দিতে পারলাম না পান্না, কিছুতেই পারলাম না।

বড়ে সাব!

আমি ধার করে টাকা এনে ওর সৎকার করলাম, কিন্তু এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেবার সময় আমার পাপের টাকা দিয়ে ওর নিষ্কলঙ্ক দেহকে আমি কিছুতেই অপবিত্র করতে পারলাম না!

চোখের জল ফেলতে ফেলতে পান্না আত্মবিস্মৃত হয়ে বড় সাহেবের পাশে বসে বসেই বললো, কাঁদবেন না বড়ে সাব, কাঁদবেন না।

বলাইয়ের তিনটে মেয়ের মধ্যে এই হতভাগী মেয়েটাই আমাকে সব চাইতে ভালবাসত। আমাকে কি বলে ডাকত জান পান্না?

কি?

ছেলে। আমি ওকে কি বলে ডাকতাম জান?

কি?

নতুন মা। ওর কথা, ওর চেহারা মনে পড়লেই আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারি না।

পান্না দু-হাত দিয়ে বড় সাহেবের মুখখানা তুলে বললো, আর কাঁদবেন না বড়ে সাব। এবার একটু চুপ করে শুয়ে থাকুন।

শোব ?

হ্যাঁ বড়ে সাব। একটু শুয়ে থাকুন।

এবার বড় সাহেব দু-হাত দিয়ে পান্নার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, পান্না, তুমি আমাকে একটু বুকের মধ্যে জড়িয়ে শোবে।

ঘরের স্তিমিত আলোয় পান্না একবার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে বড় সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দু-হাত দিয়ে ওঁকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বড় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, পান্না, আজ কি পূর্ণিমা ?

জী বড়ে সাব।

তাই আজ এত আলো।